জনক ও কালো কফি

সৈয়দ শামসুল হক

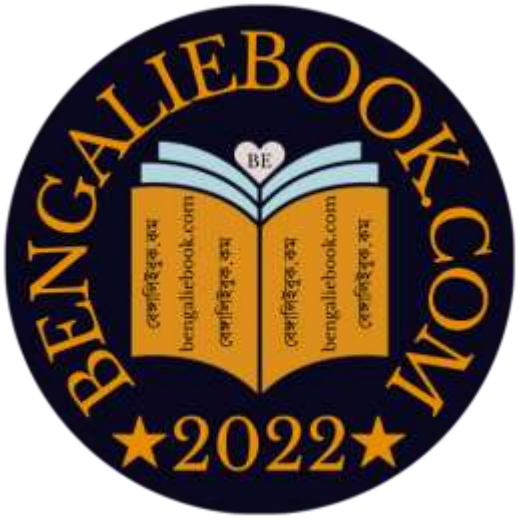

সূচিপত্র

১. আমাকে আবার ফিরে আসতে হলো 2

২. বন্ধু-স্ত্রী রাঁধেন ভালো.....29

৩. স্বপ্নের মতো জ্যোছনা নেমেছে 42

৪. চশমার কাঁচ আচ্ছন্ন হয়ে গেল 60

৫. প্রথমে ছিল দ্বিধা 83

১. আমাকে আবার ফিরে আসতে হলো

আমাকে আবার ফিরে আসতে হলো। নিশাতের সঙ্গে আমার কখনো যদি দেখা না হতো তাহলে আসতাম না। নিশাত না হয়ে অন্য কেউ হলে কী হতো জানিনে। নিশাত এতদিন আমার কাছে কাছে, ওকে ছাড়া এই যে আমি আর কিছু ভাবতে পারিনে, এই যে আমার সব কাজ, সব ভবিষ্যতের মধ্যে কেবল নিশাতের মুখ দেখতে পাই– তবু এতদিন এখানে ফিরে আসার কথা মনে আসেনি। আজ আসতে হলো।

মা'র কাছে আমি ছাব্বিশ বছর পরে ফিরে আসছি। নিশাত বলেছে, আমার বউ হতে ওর কোনো আপত্তি নেই।

বউ? আমার বউ? চব্বিশ ঘণ্টা আমার শয়নে জাগরণে তন্দ্রায় কি স্বপ্নে একটা মেয়ে থাকবে। যেখানেই যাই না কেন, ফিরে এলে ঘরে দেখব একটি মুখ, হাসিতে খুশিতে ভরা; খামের মধ্যে উঁকি দেয়া চিঠির মতো উৎসুক একটি মেয়ে। তাকে সকালে দেখব সবুজ পেস্ট ব্রাশে লাগিয়ে দাতে ঘষে ঘষে ফেনা তুলে দাঁত মাজছে; দেখব ভিজে চুলে একাকার হয়ে এক পায়ে স্যাণ্ডেলে গলাতে গলাতে বেরিয়ে আসছে বাথরুম থেকে; দেখব অবেলা দুপুরে ঘুমে লালায় ভিজিয়ে তুলেছে বালিশের কোণ –চকচক করছে ঠোঁট– গালে ভাঁজ পড়েছে লাল ফিতের মতো–মুখ দেখাচ্ছে নতুন তুলোয় তৈরি যেন; দেখব খাটের কোণে পা ঝুলিয়ে হাসতে হাসতে সে খুন হয়ে যাচ্ছে; দেখব রাতের অন্ধকারকে খুব ভয় করে আমার মুখের পরে ঝুঁকে পড়ে ফিসফিসিয়ে বলছে–এই ওঠো

না, আমি একটু বাইরে বেরুবো। বউ? আমার বউ? নিশাত আমার বউ হয়ে আসবে, আসতে পারে যদি আমি তুলে নিই, বলেছে। যেন একটা সরোদ হঠাৎ সোনার কমলের মতো বিরাট এক ফুল তৈরি করতে লাগল আমার বুকের মধ্যে, চোখের পরে, যখন কথাটা শুনলাম। আমরা, আমি আর নিশাত, তখন স্কুটারে মোহাম্মদপুর থেকে শহরের দিকে আসছি। সন্ধ্যেটা কেবল হয়েছে, বাতিগুলো তখনো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে না, ছেলেমেয়েরা তখনো রাস্তায়। আর একটা লাল মেঘ নতুন শালের মতো ঝকঝক করছে পশ্চিম আকাশে।

নিশাত থাকে মোহাম্মদপুরে। ওকে দেখতে গিয়েছিলাম। আমাদের দেখা হতো বড় মজা করে। বড় রাস্তা থেকে সুরকি ঢালা সরু একটা গলি চলে গেছে কাঁঠাল গাছের তলা দিয়ে ডানদিকে, মাঠের সঙ্গে মিশেছে। মাঠ পেরিয়ে বর্ষার পানি ভরা ডোবা। সে ডোবার পাড় দিয়ে ভিজে এঁটেল মাটি পেরিয়ে বাঁদিকে বেড়ায় ঢাকা টিনের ছোট্ট একটা বাড়ি। নিশাতদের। ওর ভাইজান ৫০ সালের রায়টের পর কলকাতা থেকে এসে কিনেছিল। ওর ভাবীর ছোট্ট ছেলে থোকনটাকে সারাদিন চোখে চোখে রাখতে হয়, কখন পানিতে পড়ে; পানির দিকে ওর এত লোভ, ছাড়া পেলেই টলমল করতে করতে ডোবার পানিতে গিয়ে মুখ দেখাবার চেষ্টা করবে। সেবার ওপাশের রায়হানরা দেখেছিল, নইলে ঠিক মরতো। আরেকবার নিশাতের বুকে ঘুমিয়ে পড়েছিল দুপুরে। নিশাতও। কখন যে উঠে গেছে জানে না। ভাবী খুব বকেছিলেন নিশাতকে। কাঁধের ব্যাগটা ঘোরাতে ঘোরাতে নিশাত আমাকে বলেছিল, বাবারে বাবা এত দুষ্টু। আমার নিজের ছেলে হলে মার খেয়ে মানুষ হতো। নিশাতের মুখে নিজের ছেলে শুনে অবধি ধুক করে উঠেছিল আমার ভেতরটা। তখনো নিশাতকে বলিনি, ওকে আমি বিয়ে করতে চাই। মেয়েদের সম্পর্কে

গল্প–উপন্যাস–সিনেমা থেকে আর বন্ধুবান্ধবের কাছে মেলারকম শুনে শুনে একত্রিশ বছর বয়স করেছি। শুনেছি, ওরা নাকি বড় চাপা, মুখে কিছু বলবে না, যদি বলে তো আকারে বলবে, ইঙ্গিতে বলবে, নীরব চোখে নাচন তুলে জানাবে, কথায় কখনো না।

খুব স্পষ্ট মনে আছে আমার, সেদিন নিশাতের মুখে নিজের ছেলে কথাটা আমাকে বেশ চঞ্চল করে তুলেছিল। তারপর নিশাত যে সারক্ষণ বকবক করে কী বলেছিল কিসসু আমার মাথায় যাচ্ছিল না। আমার চোখের ভেতরে আমি যে সমস্ত জিনিস ভালোবাসি, যেমন নতুন চাদর, লাল ফুল, সিনেমার বড় বড় পোস্টার, স্টেডিয়ামের মোড়, নিশাত–এই জিনিসগুলো অর্থহীন কারণহীন একটা নাচ করছিল। ঘুরে ঘুরে, একটার গায়ে আরেকটা গড়িয়ে পড়ে আমাকে তন্ময় করে রাখছিল। আর কার যেন সুন্দর গানের মতো একটা তান শুনতে পাচ্ছিলাম। সেই তানের ভেতর থেকে পাড়ের বুনোনের মতো একটা ছলোছলো আবছা হাসি শুধু। আর কিছু না। হঠাৎ চোখ তুলে দেখি বড় রাস্তা থেকে সুরকি ঢালা গলির মুখে কাঁঠাল গাছের নিচে আমি একা দাঁড়িয়ে। আর নিশাত চলে যাচ্ছে। তার পেছনটা শাড়ির ফুলে ফুলে আচ্ছন্ন, একটা অতিকায় ফুলদানির মতো দেখাচ্ছে। তখন মনে পড়ল, একটু আগেই তো নিশাত বলল, আমি যাচ্ছি আর আমি বললাম, আচ্ছা।

যে কথা বলছিলাম। নিশাতের সঙ্গে আমার দেখা হতো বড় মজার। গলিটার মুখে একটা নতুন ওঠা দোতলা বাড়ি, তার সামনের জমিতে টিনের একটা শেভ তুলে দিয়েছে বাড়িওলা। শেডের মধ্যে তিনটে দোকান। একটা লন্ড্রী। একটা মুদিখানা। আর এপাশে চায়ের দোকান। চায়ের ওখানে আমি এসে বসি বাস থেকে নেমে। একা যখন আসি

তখন বাসে। নিশাতের সঙ্গে বেরুতে হলে স্কুটার। স্কুটারে চাপতে আমার খুব ভালো লাগে। হেলান দিয়ে বসে, একটা হাত সিটের মাথায় বিছিয়ে, ঝরঝর ভটভট করতে করতে পীচঢালা রাস্তা দিয়ে দালান ইস্কুল পেট্রলপাম্প সায়েন্স ল্যাবরেটরী পেছনে ফেলে নিউ মার্কেটের মোড়ে শোঁ-ও করে বাঁক নিয়ে চলতে আমার ভারী আনন্দ। নিশাতের আগে মাথা ধরে যেতো স্কুটারের ঐ কটকটানিতে। আজকাল কিছু বলে না। মেয়েরা নাকি যাকে ভালোবাসে তার অপছন্দটাকেও পছন্দ করে নেয়। আমার এটা ভালোই লাগে যে নিশাত আমার স্কুটার চাপার আনন্দটাকে নিজের কষ্ট তুচ্ছ করে বড় করে দেখছে। এতে হাতেনাতে একটা প্রমাণ পেয়ে যাওয়ার তৃপ্তি হয় আমার যে নিশাত আমাকে ভালোবাসে।

সেই চা-দোকানে বসে থাকব। বসে বসে এক কাপ চা আর অনেকগুলো সিগারেট খাবো। এইসব সাংঘাতিক মিষ্টি আর কাঁচা দুধের সন্ধ ধরা চা খেতে একটুও ভালো না, তবু। দেয়ালে অনেকগুলো ক্যালেন্ডার। কোনটাতে সিনেমা স্টারদের ছবি, কোণে সাবানের নক্সা, আবার কোনটাতে ঝিল পাহাড় কী নদীতে পাল তোলা নৌকার রঙ্গিন সিনারি। দোকানে টেবিলের ঢাকনা থেকে দুপুরে খেয়ে যাওয়া মাছ তরকারির আঁশটে ভিজে ভিজে গন্ধ দেবে। পেছন থেকে অবিরাম গ্লাশ বাসন কাপ ধোয়ার টুংটাং ছলছলাৎ শব্দ আসবে। বিকেলটা নামতে থাকবে থিয়েটারের স্ক্রীনের মতো দুলতে দুলতে। ইট বোঝাই একটা দুটো ট্রাক এসে দাঁড়াবে। মাল খালাশের হুল্লোড় শোনা যাবে সারাক্ষণ। তারপর দোকানের রেডিওটা খুলবে ওরা। পাঁচটা বাজেনি। এক মিনিট কী দুমিনিট বাকি। রেডিও থেকে একটানা সিগনেচার টিউন আকাশ বাতাস জুড়ে বড় বড় আঁচড় টানছে যেন। হঠাৎ সেটা থেমে যাবে। ঢং ঢং করে বাজবে ঘণ্টা। শোনা যাবে অনুষ্ঠান

আরম্ভের ঘোষণা। আর তক্ষুণি দেখতে পাবো নিশাত গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তাটা দিয়ে খুব আনমনা হাঁটছে। তার কাঁধের ওপর বড় খোঁপা থেকে কী একটা শাদার ওপর পড়ন্ত সূর্যের আলো ঝিলিক দিয়ে দিয়ে উঠছে; হেয়ার পিনের রূপোলি তীরটা, নয়ত জরির শাদা রিবন। তখন আমি উঠে দাঁড়াবো। হাঁটতে হাঁটতে যখন দেখব নিশাত ইস্কুলের কাছে চলে গেছে, তখন কাছে গিয়ে দাঁড়াবো। দেখেই নিশাত হাসবে। বলবে, কতক্ষণ? বলবো, এইতো, এইমাত্র।

নিশাত কলেজে পড়ায়। বলে, আমি একটা লেকচারার। রাস্তার মোড়ে দোকানগুলোতে কী সব আড্ডা। দুজনকে দেখলে খামোকা হি-হি করবে। তাই বেশ খানিকটা দূরে না গেলে দেখা হয় না। আমার অবশ্যি এসব বালাই নেই। এক এ্যাডভোকেটের জুনিয়র আমি; মককেলের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করবার সময় আসেনি। তাছাড়া, রাস্তায় কোনো মেয়ের সঙ্গে দেখবে আমার মকেল, দেখুক–পুরুষদের ব্যাপারে সুবিধে অনেক, বদনাম কম। ও নিয়ে মাথা ঘামাইনে। নিশাতের দিকটা ভাবতে হয়। বাড়িতে যেতে পারি, যেতে দেবে না ও। বলবে, ভাইজান আমাকে খুব ভালোবাসে। কিছু বলবে না তোমাকে। তবু যাবে কেন? এটাও আমি বুঝতে পারি। লজ্জার অবকাশ রাখতে চায় নিশাত, ভয় নেই তবু ভয়কে কল্পনা করতে চায় মেয়েটা। ভাবতে চায়, তার ভালোবাসায় বাধা অনেক, বিপদ বহু। লেখাপড়া শিখেছে, চাকরি করছে, সংসারের একমাত্র মাথা বড় ভাই প্রশ্রয়ে আদরে বোনকে গড়ে তুলেছেন–তবু, তবু নিশাত তার হৃদয়ের ব্যাপারে যেন কল্পনা করে নিজেকে সেই মেয়েটির মতো যাকে থাকতে হয় চার দেয়ালের মধ্যে, বেরুতে হয় লুকিয়ে, কথা বলতে হয় ফিসফিসিয়ে। বেড়ালের পায়ের শব্দে শাদা হয়ে যেতে হয় ভয়ে। আমি এটা প্রথমে বুঝিনি, বুঝেছি অনেক পরে। কিন্তু নিশাতকে বলিনি।

আমার ভাবতে ভালো লাগে, নিশাতের একটা কথা জানি যা নিশাত জানে না আমি জানি। ভারী একটা বোকা ছেলেমানুষের মতো লাগে তখন নিশাতকে। যেন খেলনা–টেলনা কিনে দেয়া যাবে টানতে টানতে মেলায় নিয়ে গিয়ে।

কদিন আগে আমার সিনিয়র কাজি সাহেব একটা খুনের কেসের আসামিকে বেকসুর খালাস করিয়ে দিলেন। জুনিয়র ছিলাম আমি আর শরিফ। দুজনে কিছু মোটা টাকা পাওয়া গেল। সিনিয়র আমার কাজের খুব প্রশংসা করলেন বাসায় একা ডেকে। তাঁর ছোট শালী রুমি থাকত এ বাড়িতে। কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে এবার। রুমি চিড়ে ভাজা আর চা এনে রাখলো। আড়চোখে তাকাল একবার আমার দিকে। চোখের কোণে ঝিলিক দিয়ে উঠলো হাসি! ছুট দিল ভেতরে।

মেয়েটা কালো, নাকটা কেমন ছড়ানো, পাতলা ঠোঁট, শরীরটা ছিপছিপে, ভালো করে কাপড় পড়তে জানে না, রংও চেনেনা। সবুজ শাড়ি পরেছে। ভারী বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে। কিন্তু খুব চঞ্চল। ঐ চঞ্চলতাটুকুর জন্যে একেক সময় আমার ভালো লাগে। কোন কোন দিন একটু দেখতেও ইচ্ছে করে এক মুহূর্তের জন্যে। তারপর আর মনে থাকে না। আবার একেকদিন আমার সিনিয়রের পুরনো ফোর্ডে চেপে কোর্টে যাবার পথে রুমি এসে সামনে বসে। সে কলেজে যাবে। সারাক্ষণ তার ভিজে ভিজে বেণি দুটো বড়ড ভারী আর নির্জীব দেখাবে, তেলে মলিন লাল ফিতেটা থেকে কী কোথা থেকে একটা জ্বালা ধরানো গন্ধ বেরুবে। মেয়েটা আমার সিনিয়রের লায়াবিলিটি। শ্বশুর মারা যাবার সময় জামাইর হাতে তুলে দিয়েছিলেন বলে শরিফ বলছিল। শরিফকে বলেছিলাম, তুমি বিয়ে করো। উন্নতি চড় চড় করে হবে। ভদ্রলোকও বাঁচবেন। তোমার নতুন করে এস্টাবলিশমেন্টের

খরচ আর লাগবে। শুনে শরিফ নাক সিটকে ওয়াক করে নাটকীয় ভঙ্গিতে থুতু ফেলে বলেছে, তোবা তোবা। তুমি থাকতে আমি? ময়ূর থাকতে দাঁড়কাক?

ব্যঙ্গচ্ছলে শরিফ নিজেকে দাঁড়কাক আর আমাকে ময়ূর বলেছে। উপমাটা বেজেছে কিন্তু আমার অন্যখানে গিয়ে। রুমি আর নিশাত। নিশাত আমার ময়ূর।

এটা একটা মুশকিল হয়েছে। আমি মাঝে মাঝে টের পাই, কোনো কারণ নয় এমনিতেই যেন বুঝতে পারি, আমাকে নিয়ে কথা হয়। মনে হয়, কাজি সাহেব আমার চারদিক থেকে জাল এমনভাবে গুটিয়ে আনছেন যেন একদিন সঙ্কুচিত হতে হতে হঠাৎ দেখতে পাবো আমি রুমির বাহুবন্ধনে বাঁধা পড়ে গেছি। একেকদিন খুব অস্বস্তি করে যখন ভাবনাটা হয়ে ওঠে। প্রবল। চেম্বারে বসে ঘামতে থাকি। বেরুতে পারলে যেন বাঁচি।

আবার নিঃশ্বাস ফেলি মুক্তির। কারণ, তখন হঠাৎ সব তুচ্ছ হয়ে যায়। হাসি পায়। ভাবি, আমি ব্যাচেলের বলেই আমার ম্যানিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে, যে-কোনো কন্যাদায়গ্রস্ত লোককে সন্দেহ করা। আর এ-ও বোঝাই নিজেকে তুমি তো বেশ লোক হে? কাজি সাহেব বললেই তো আর বিয়ে হয়ে যাচ্ছে না। তুমি যদি না করো তো সাধ্য কী তোমাকে রাজি করায়। এ নিয়ে এত দুশ্চিন্তা করবার, ভয় পাবার কী আছে?

কিন্তু ভয় হতো। ভয় হতো, যখন কোনো কোনো রাতে, ফাঁকা চেম্বারে আমি আর কাজি সাহেব বসে থাকতাম আর উনি অহেতুক প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেন পরিবারে; বড় ছেলেটার যে ফেল করে টো টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ছোট মেয়েটা যে এবার নাচের

স্কুলে ভর্তি হবে বলে বায়না ধরেছে, স্ত্রীর অসুখ লেগেই আছে, তিনি আর কত দিন বাঁচবেন, দীর্ঘনিঃশ্বাস, শ্যালকেরা কেউ মানুষ হলো না, প্রতিবেশীর সঙ্গে পেছনের জমির মালিকানা নিয়ে মামলা এবং রুমিটা বড় হচ্ছে–এইসব শুনতে শুনতে আমার ভয় করত। আমি হাঁ–নার বেশি কিছু বলতে পারতাম না। আমার তখন উঠে যেতে ইচ্ছে করত। কিন্তু ওঠবার আগেই, দৈবেরই কী ইচ্ছা আমাকে হেনস্তা করবার, দেখতাম রুমি এসে দাঁড়িয়েছে; বলছে–আপা রাতে আপনাকে খেয়ে যেতে বলেছে, আমার তখন হৃৎস্পন্দন বন্ধ হবার যোগাড়। যেন একটা ষড়যন্ত্রের আভাস দেখতে পাই চারদিকে, সব কিছুতে। রুমির এই হঠাৎ আসাটাকে কাজি সাহেবের সুচিন্তিত একটা চাল মনে করে শিউরে উঠি।

গোড়ার দিকে বুঝতেই পারতাম না, এত ভয় কিসের? রুমি কালো বলে? কুৎসিৎ? না, সে রুচিতে শ্রীমতি নয় বলে? আচ্ছা যদি রুমি দেখতে খুব ভালো হতো? ফর্সা হতো? নিশাতের মতো। তাহলে?

নিশাতকে বলতে পারতাম না। মেয়েরা এ ধরনের কথা শুনতে আদৌ পছন্দ করে না, তারা খেপে যায়–এ রকম একটা ধারণা আমার আছে। হোক রুমি কালো, দেখতে ভালো না, চাই কি নিশাত একটা ফালতু ঝামেলা করে বতে পারে। তাছাড়া বলব কী, নিশাতের কাছে যতক্ষণ থাকি বিশ্বসংসারের আর কারো কথা মনে পড়ে না আমার। রুমিকে নিয়ে দুর্ভাবনার সীমা ঐ চেম্বার পর্যন্তই। আর কখনো কখনো যখন গাড়িতে ওর সহযাত্রী আমাকে হতে হয়। পরে একদিন আবিষ্কার করেছি ভয়ের কারণটা। চিন্তা করে নয় ভাবনা করে নয়, কিছু না। একটা রেস্তোরাঁয় বসে কফি খাচ্ছি–কালো, দুধ ছাড়া কোন

একটা উপন্যাসে পড়েছিলাম কে যেন কালো কফি খেতে ভালবাসত সেই থেকে অভ্যেসটা। নাকে এসে লাগছিল রকফির ঝাঁঝালো মিষ্টি ঘ্রাণ আর ধোঁয়ায় বারবার মেঘলা হয়ে যাচ্ছিল আমার চশমার কাঁচ, তখন হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেললাম কারণটা।

ভয় আমার জীবিকার উপার্জনের, প্রতিষ্ঠার। কাজি সাহেব যদি বলেন আর আমি রুমিকে বিয়ে না করি, তাহলে আমাকে তার চেম্বার ছেড়ে দিতে হবে– এইটেই আমার অজ্ঞাতে জন্ম দিয়েছে ঐ ভয়টার। কাজি সাহেবের মতো খ্যাতনামা, প্রতিপত্তিসম্পন্ন এ্যাডভোকেটের জুনিয়র হতে পারাটা ভাগ্যের কথা; পশার তার অমিত সম্ভাবনায় ভরা। সেই কাজি সাহেব যদি আমাকে খারিজ করে দেন তো আমাকে পথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। আবার নতুন করে শুরু করতে হবে জীবন। আবার সেই সংগ্রাম। মাসে যে আজ আমার শচার পাঁচেক আসছে– এর ধারা বন্ধ হয়ে যাওয়ার অর্থ আমার সব স্বপ্নের মৃত্যু।

আমি তো জানি কী ভীষণ এই একাকীত্ব, এই টাকা না থাকাটা, এই লড়াই।

ছোটবেলায় বাবা মারা যাবার পর, আমার তখন চার বছর বয়স শুনেছি, মার আবার বিয়ে হলো। আমাকে রেখে গেলেন চাচাদের হাতে। তার নতুন স্বামীকে দেখিনি কখনো। মা কেও তারপর থেকে আর কোনদিন না। চাচাদের কাছে ভয়ঙ্কর বর্ণনা শুনতাম। লোকটা খুব চাষা, চোয়াড়ে আর বিস্তর টাকা তার। মামারা কেউ ছিলেন না, মামা–বাড়ির অবস্থা ছিল খুব খারাপ। মা–কে তাই আবার নতুন ঘর করতে যেতে হয়েছিল। আমার এসব কিস্‌সু মনে নেই। কেবল একটা ছবি মনে আছে, আমাকে কোলে করে দলা করে ভাত পাকিয়ে ছড়া বলতে বলতে মা খাইয়ে দিচ্ছেন। চেহারাটা মনে নেই। ঘরে একটা

ডিবে জ্বলছে। খুব ধোঁয়া হয়েছে। আর একটা ছবি, গোরস্তানে বাবাকে ওরা কবর দিতে নিয়ে গেছে। আমিও গেছি। আমি আমার সমান কয়েকটা ছেলের সঙ্গে দূরে একটা ভাঙা কবর থেকে ছাতার গোড়া দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তুলছি একটা মড়ার খুলি আর খুব মজা পাচ্ছি। খুব রোদ বলে আমাকে ছাতাটা দিয়েছিল। খুলিটাকে গড়াতে গড়াতে নিয়ে যাচ্ছি বালু–বালু মাটির ওপর দিয়ে, থানকুনি পাতার ভেতর দিয়ে, কারা যেন গাদা ফুলের গাছ লাগিয়েছে তার দিকে। মেলা ফুল ফুটেছে হলুদ হলুদ। ছাতাটাকে আমি কিছুতেই বাগে আনতে পারছি না। এমন সময় কে একজন এসে বলল, গ্যাদা, শীগগীর আসো। তোমার বাপেরে না মাটি দিতাছে, দেখবা না? ব্যাস এইটুকু। আর কিছু মনে নেই। আমি গিয়েছিলাম কী গিয়েছিলাম না, দেখেছিলাম কী দেখেছিলাম না কতদিন ভাবতে চেষ্টা করেছি একেবারে শাদা, কুয়াশার মতো। কিছু মনে পড়ে না।

চাচারা খুব কালো মুখ করে দেখতেন আমাকে। আমি সেই ছোটবেলা থেকেই জানতাম, যাদের বাবা নেই তাদের কেউ নেই। ইস্কুলে আমাদের হেডমাস্টার ক্লাশের ছেলেদের বলতেন, ওর সঙ্গে কেউ খারাপ ব্যবহার করো না যেন। ওর বাবা নেই! ওর কত দুঃখ। দুঃখের কথা শুনে খুব আবছা একটা গর্ব হতো তখন। আমি সবার থেকে আলাদা। ক্লাশে একদিন ইংরেজির স্যার অরফান শব্দের বাংলা বলতে গিয়ে উদাহরণ দিলেন আমাকে। ভারী ফুর্তি হলো আমার। এখন মনে পড়লে মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়। আবার ভাবি, বেশ ছিলাম তখন। দুঃখকে দুঃখ মনে হতো না, আনন্দকে বুঝতে পারতাম না তখন। মানুষ বড় হলেও যদি এ রকম হতো তাহলে তাকে বুঝি সুখী বলতো সবাই। কিন্তু ওটাতো অবোধের কাল। এখন এই যে আমি বড় হয়েছি, দুঃখ হলে দুঃখটাকে একেবারে ভেতর থেকে নিংড়ে নিংড়ে বেরোতে দেখছি, এক ঝলক আলোর মতো

আবার আনন্দে ভরে উঠছি আর সেই আনন্দটুকু স্মৃতির মধ্যে প্রদীপের মতো জ্বলছে, এই শক্তিটার নাম বোধ হয় জীবন।

চাচারা অনেক করেছেন। এম.এ. পরীক্ষায় যখন থার্ড ক্লাস পেলাম, বকলেন তারা। কী যে দুর্বুদ্ধি হয়েছিল, সিএসপি-র জন্য পরীক্ষা দিলাম। চাচারা খুব খুশি হলেন। বললেন, গ্যাদা হাকিম হলি পর বংশের একটা নাম থাকে। আল্লার উপর ঈমান রাখলি সব হয়। চাচারা আমাকে গ্যাদা গ্যাদা বলেই ডাকেন। আমার নাম যে মুশতাক সেটা মনে হয় ওঁরা জানেনও না। সিএসপি পরীক্ষাতে কিছু হলো না। রিটেনেই ফেল করলাম। চাচারা বললেন, আর পড়াতে পারবেন না। না বললেও আমি নিজেই আর ভার হয়ে থাকতাম না। তখন কিছু দিন বিরাট এক শূন্যতার ভেতর দিয়ে আমার জীবন কাটলো। চার বছর।

এই চারটে বছরের কোন স্মৃতিই আমার নেই। যেন এই চার বছররের এক হাজার চারশো ষাট দিন একরকম। সেই সকালে দেরি করে ঘুম থেকে ওঠা, জুবিলি স্কুলে ইতিহাস পড়ানো সেভেন আর এইট ক্লাশে, তারপর বিকেল থেকে নিয়ে রাত এগারটা অবধি ফরাসগঞ্জে গোবিন্দর সরু তেল কালিতে আচ্ছন্ন, কয়লার ধোঁয়ায় হাঁসফাস রেস্তোরাঁয় বসে আড্ডা দেয়া। শেষদিকে তো রেস্তোরাঁর পেছনে কয়লা আর কাঠ রাখবার শেডে বসে ফ্লাস খেলতে শুরু করেছিলাম। একট; পায়া-ভাঙা নড়বড়ে টেবিল ছিল, দুদিকে দুটো বেঞ্চ আর আধখানা, মানে পিঠ-ভাঙা, টিনের চেয়ার। রোজ সন্ধ্যেয় সেখানে ফ্লাস বসতো। কোনদিন হারতাম, কোনদিন জিততাম। আমার ভাগ্যে চূড়ান্ত কিছু লেখা ছিল না। অনেকে ছিল রোজ হারতো, আবার অনেকে জিতে যেত দিনের পর

দিন। দেখতাম, কেবল আমিই আলাদা। গোবিন্দ যখন চপ দেয় তখন সঙ্গে একটা ছোট্ট ভিনিগারের শিশি আসে। সে শিশিটা কেউ খোলে না। বিস্বাদ নাকি। কিন্তু টেবিলে নিত্য আসা চাই। আমার অস্তিত্ব ছিল ঐ ভিনিগারের শিশিটার মতো!

তখন নিশাতের সঙ্গে আমার দেখা।

তারপর একদিন সকালে ঘুম থেকে জেগেও বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে হলো না। মনে হলো, আমার সমস্ত শক্তি গতরাতে কে যেন নিঃশেষে বার করে নিয়ে গেছে। জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা সুন্দর একটা বাতাস বারে বারে সে আমার মুখ ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে। একবার খুব দাপাদাপি করে বাতাসটা এলো। আর আমার তখন কান্না পেল। আমার এক বন্ধু বিয়ে করেছে, তার সঙ্গে থাকি। বাইরের ঘরটার আব্রু নেই। চাটা আসবে ঘর ঝাট দিতে। কাঁদতে লজ্জা করল আমার। যদি নিজের বাসা থাকতো–বাসা করবার মতো যদি কিছু করতাম আমি।

ছেলেবেলায় পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুলে রাতে শুয়ে শুয়ে ঘুম আসত না একেকবার। প্রতিজ্ঞা করতাম, সামনের বছর ফার্স্ট হবই হব, যেমন ওরা সবাই হয়। ঠিক সেই রকম করে উঠল বুকের ভেতরটা। নিশাতকে গিয়ে বললাম, আমি ল পড়ব।

নিশাত একেবারে আকাশ থেকে পড়ার মতো চেহারা বানিয়ে মুখ গোল করে প্রতিধ্বনি করল, ল?

সেই থেকে শুরু হলো আমার নতুন করে চলা। একেবারে সব ভুলতে শুরু করলাম। অতীতের সবকিছু। কী করে, কিছু বলতে পারব না। দেশের কথা আর মনে পড়ে না, চাচাদেরও না। সেই মেজো চাচির কথা, যার সঙ্গে রাতে ঘুমোতাম, তাকেও না। যেন ওসব অন্য কারো জীবনের গল্প। যেন আমি জন্ম থেকে এখানে এমন করে রাতে রাতে ল পড়ছি, কখনো দেখা হচ্ছে নিশাতের সঙ্গে, হাঁটছি স্টেডিয়ামের মোড়ে, আমার বন্ধু-স্ত্রী বাচ্চা হবে বলে হাসপাতালে গেছে– দুবন্ধুতে হাত পুড়িয়ে রান্না করছি, সিনেমার পোস্টারে অতিকায় মুখগুলো থমকে দাঁড়িয়ে দেখছি।

আশ্চর্য, চাচারাও ভুলে গেলেন আমাকে। হাকিম হয়ে বংশের নাম পেটাতে পারলাম না। বোধহয় সেই দুঃখে। কখন যে আমার জীবনের সব কটা নোঙর আস্তে আস্তে খসে পড়ল তার এতটুকু বুঝতে পারিনি। নিঃশব্দে একটা বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেল, কেউ জানতে পারল না। তাকিয়ে দেখি, নতুন নোঙর কখন আমি ফেলে বসে আছি; কখন সেই বাঁধনে স্থির হয়ে বড় বড় ঢেউগুলোকে অনায়াসে কাটাতে পারছি; আমার জীবন বড় সুমিত হয়ে গেছে; অনেক কাদা ভোবা খানা খন্দ পেরিয়ে সাজানো গোছানো ছবির মতো বড়

বাড়ির নিরিবিলি বাগানে গিয়ে দাঁড়ালে যেমন হয় তেমনি। নিশাত। ভারী সুন্দর নামটা। ওর চেহারার সঙ্গে, চলনের সঙ্গে, চিবুক তুলে কথা বলবার ধরনটার সঙ্গে নামটার কোথায় যেন মিল আছে। মিলটা যে কী, আর কোথায়, জিগ্যেস করলে তা বলা যাবে না– কেবল অনুভব করা যায়। একেকটা নাম, কী জানি কেন, উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশার মতো কল্পনার ভেতর থেকে একটা মুখ ভেসে উঠতে থাকে। সেই মনে

করা মুখটার সঙ্গে কখনো আসল মানুষটার আশ্চর্য মিল থাকে, কখনো থাকে না। নিশাতকে বলেছিলাম। শুনে অবধি ও এমন উচ্চকণ্ঠে হাসতে লাগল।

.

বলছিলাম না, নিশাতের সঙ্গে সেদিন দেখা করতে গিয়েছিলাম। মনটা ছিল অসম্ভব রকমে ভালো। খুনের মামলায় জিতে যাওয়ার দরুণ করকরে টাকাগুলো ছিল পকেটে। অক্টোবরের শীত-শীত দেখে আমার ফিকে সবুজ জাম্পারটা বার করে পরেছিলাম। রুমালটা পকেটে ঢোকাতে গিয়ে দেখি মলিন হয়ে আছে। জিন্নাহ এভেন্যুতে এসে একটা শাদা ফিনফিনে রুমাল ভারী পছন্দ হলো। দাম তিন টাকা বারো আনা। মসৃণ, ইস্ত্রী করা, হাতে রাখলে যেন পিছলে পড়ে যাবে। পকেটে সারাক্ষণ হাত ঢুকিয়ে অনুভব করতে লাগলাম রুমালটার স্পর্শ। নিশাত বোধহয় এতক্ষণ কলেজ থেকে ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে আয়নায় নিজেকে দেখছে।

আজ আর চা-দোকানে বসতে ভালো লাগল না। সেই অল্প অল্প বাতাসে পাতা-পত্তর দুলতে থাকা কাঁঠাল গাছের গোল ছায়ায় দাঁড়িয়ে রইলাম। নিশাতের সঙ্গে দেখা হতো রোববার আর বুধবার। আজ বুধবার, নিশাতের কলেজ ছিল চারটে অবধি। সুরকির পরে আমার ফেলে দেওয়া সিগারেটের টুকরো থেকে পাকিয়ে পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে। জাম্পারটা থেকে ট্রাঙ্কের ঘ্রাণ এসে নাকে লাগছে আমার। আর বুকের ভেতরটা উদ্বেগে অস্থির- যেন কী হয়, কী হয়।

বাঁক পেরিয়ে নিশাত বেরিয়ে এলো! থমকে দাঁড়াল আমাকে দেখে। যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেছে। তারপর মুখটা নিচু করে হাসি ফুটিয়ে কাছে এসে বলল, আজ এখানে যে। চা-দোকানটা বড় বাজে আর নোংরা।

এতদিনে বুঝলে?

বড় রাস্তায় আমরা পা রেখে বললাম, শোনো, আজ অনেক কটা কথা বলব।

আজ ভাবী তাড়াতাড়ি ফিরতে বলেছেন।

আজ আমাদের অনেক দেরি হবে।

বাড়িতে মেহমান আসবে। বলল নিশাত।

বাড়ির তো গিন্নি আছে।

মেলা কথাটা কী?

কিসসু না। এমনি। এই– এই বেবি। পাশ দিয়ে স্কুটার যাচ্ছিল, সেটাকে থামাবার জন্যে চিৎকার করলাম। কিন্তু থামল না। টুক করে বাতি জ্বলে উঠল রাস্তার। আমাদের চোখের

সামনে যতদূর পথ বেঁকে গিয়েছে, একটা আলোর রেখা পোস্টের মাথায় মাথায় নাচতে লাগল। স্থির হলো।

বললাম, নিশাত, দ্যাখো, আজ আমার অনেক কথা আছে।

আহা, তাই তো জিগ্যেস করছি, কী কথা?

যেন আমি একটা জিনিস কিছুতেই বুঝতে পারছি না, নিশাত তাই আমাকে তিরস্কার করছে। বললাম, সেটা এভাবে বলা যায় না।

নাহ, একটা স্কুটারও পাওয়া যাচ্ছে না। স্কুটারে চাপবার জন্যে উসখুস করছে মনটা, ভালো লাগছে না হাঁটতে কিন্তু হাঁটতে হচ্ছে। একবার দাঁড়ালাম আমি। দাঁড়াল না নিশাত। তখন আবার আমাকে হাঁটতে হলো। তখন আর নিশাতের দিকে দেখতে পারছি না, সামনে দেখছি আর বারবার পেছনে। বারবার উচ্চকিত হচ্ছি দূরের কোনো যানবাহনের শব্দে। একটা স্কুটারও কি আজ আসতে নেই এদিকে? পথে নিশাতের সঙ্গে এক মহিলার দেখা হলো। তিন বাচ্চা তার সঙ্গে। এক মুখ হাসি। চওড়া পাড় শাড়িটা সমস্ত শরীরে পল্লবিত অতএব আমাকে দূরে দাঁড়াতে হলো।

স্কুটারে উঠতে উঠতে নিশাত বলল, খামোকা দেরি হয়ে গেল। তারপর অন্যমনস্কভাবে জানাল, আজ কলেজে নতুন প্রিন্সিপাল এলেন।

আমি বললাম, আগে নিউমার্কেট, নিউমার্কেট থেকে–আচ্ছা, চলো দেখি, বলছি।

নিশাত কী যেন বলল, সেটা শুনতে পেলাম না। প্রচণ্ড আওয়াজ করছে স্কুটার। বোধহয় গিয়ার আটকে গেছে। হাতলটা ঘোরাচ্ছে খুব। আমি চেঁচিয়ে বললাম নিশাতকে, কিছু বলবে?

তখন নিশাতও গলা তুলে বলল, বলছিলাম–উহ্, কী শব্দ–নিউমার্কেট কেন?

এমনি। কোথাও তো যেতে হবে।

তবু ভালো। ভাবলাম, ওখানে বুঝি তোমার কথা কিনে আমাকে বলতে হবে।

আওয়াজটা সয়ে এসেছে। নিশাতের গলা তাই ঝন্‌ঝন্ করতে লাগল আমার কানে। বেসুরা ঠেকল। বললাম, ঠাণ্ডা পড়েছে।

তুমি তো জাম্পার চড়িয়েছে।

তুমি একটা কিছু গায়ে দিয়ে এলে পারতে।

হাসল নিশাত। বলল, মাফলারটা বাদ পড়ল কেন?

আমাদের কথাবার্তাই ঐ কম। একেকজন একেকটা বলতে থাকি–আরেকজনের উত্তর দেয়া হয় না। যেন চিন্তার দুটি বেণি পাকিয়ে পাকিয়ে কেবলি নামতে থাকে–এক হয়ে যায় না। বেশ লাগে। অনেক অহেতুক কথা মনের ভেতরে জমতে জমতে ভার হয়ে ওঠে, সেগুলোর একটা পথ হয়। আর শুনতে ভালো লাগে–অনেক অর্থহীন কথা এত ছন্দময় হয়ে ওঠে একেক সময়, মনে হয় সারাদিন শুনতে থাকি, ধরে রাখি, লিখি।

একবার আমার খুব শখ ছিল নিশাতকে চিঠি লেখার। কদিন লিখলাম খুব। তারপর হাঁফ ধরলো। কী লিখব, কিসসু মাথায় আসে না। কথা বলার সময়ে কেমন সহজ হয় সব, কিছু লিখতে বসলে আধখানা লিখে সেন্টেন্স আর শেষ করা যায় না। আর ওদিকে নিশাত লিখত আমার চেয়েও বড় বড় চিঠি। কেমন সাজানো গোছানো। তেলের শিশি হাত থেকে পড়ে ভেঙেছে সেটা একটা চিঠিতে লেখার বিষয় হতে পারে এই প্রথম জানলাম; কলেজে ছাত্রীদের মুখের বর্ণনা এত জীবন্ত হতে পারে তা নিশাত না হলে জানতাম না; আর কী আশ্চর্য, সেই মুখগুলের বর্ণনা, যাদের আমি হয়ত কোনদিন দেখব না, দেখলেও চিনতে পারবো না আমার এত ভালো লাগবে তাইবা কে ভেবেছিল?

চিঠি লেখার অসুবিধে অনেক। সঙ্গে সঙ্গে জবাব আসে না। পোস্টাফিস হয়ে আসতে যেতে কম করেও তিনদিন। তিনটে দিন চুপ করে বসে থাকা আর ভাবতে ভাবতে ঘুমোতে যাওয়া প্রথমদিকে বেশ লাগত। পরে কেমন অসহ্য হয়ে উঠল। নিশাতকে বললাম, চিঠি কে লেখে? আমি আর না।

গ্রীন রোডের কাছে ছুটে আসা একটা দৈত্য স্টেট বাস এড়াতে গিয়ে আমাদের স্কুটার আচমকা পাশ কাটালো। নিশাতকে ধরে না ফেললে হয়ত ছিটকে পড়ত রাস্তায়। রাস্তার লোক ইস্ ইস্ করে উঠল। আমি ড্রাইভারের জামা টেনে চিৎকার করে বললাম, পাশে করো।

পাতার মতো কাঁপছে নিশাত।

সমস্ত ব্যাপারটা এত আকস্মিক, আর আমরা এত তন্ময় হয়ে ছিলাম যে, ভালো করে বুঝতেই পারছিলাম না কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল। নিশাতের কাঁধে হাত রেখে মৃদু চাপড় দিয়ে বললাম, কী হতো বলোত? কিসসু হয়নি। আর স্কুটারওলাকে একটা টাকা দিয়ে বললাম, আর একটু হলেই–।

সে খুব বিষদৃষ্টিতে দেখল আমাদের। যেন, সে তো এ ধরনের অ্যাসিডেন্টকে হর–হামেশাই এড়াচ্ছে, আমরাই কেবল তার ওস্তাদির কদর করছি না, নেমে যাচ্ছি। নিশাতকে বললাম, একটা রিকশা নিই।

রিকশায় বসে বললাম, এই রাস্তাটায় সেদিন একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়ে গেল। স্কুটারের সঙ্গে ট্রাক। স্কুটারে ছিল গান গাইত, খেয়াল, মস্তান গামা। পড়োনি কাগজে? মারা গিছল। আমার খুব একটা খারাপ লাগছিল না। কিন্তু নিশাত চুপ করে রইলো সারাক্ষণ। বললাম, একসঙ্গে মরে গেলে একটা হৈচৈ পড়ে যেত কিন্তু! যেত না? লোকে, আমরা, মানে মনে করত আমরা স্বামী–স্ত্রী।

লজ্জা করল আমার। তাকাতে পারলাম না নিশাতের দিকে। চেনটা পড়ে গেল রিকশার। রিকশাওয়ালা যতদূর গতির মুখে যাওয়া গেল, তারপর নেমে উপুড় হয়ে পরাতে লাগলো হুইলের সঙ্গে চেন। পাবলিক লাইব্রেরীর জানালা থেকে চৌকো চৌকো আলোগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। আবার চলতে শুরু করল।

নিশাত বলল, আজ বেরুনোর মুখে ভাবীর ছেলেটা ভারী দুষ্টুমি করছিল। একটা চড় দিয়েছি।

মন খারাপ করছে?

নাহ। আবছা হেসে ফেলল নিশাত। আবার বলল, এমনি মনে পড়ল। খুব বেঁচে গেছ কিন্তু আজ।

আমার অনেকগুলো কথা ছিল। বলে নিশাতের দিকে চোখ ফিরিয়ে রাস্তার পাশে বুড়ো গাছগুলোর মাথায় মাথায় তাকালাম। শাদা মেঘ হয়েছে। চাঁদটা গেল কোথায়?

বলো, শুনছি।

বলব, এভাবে বলা যায় না।

হাসল নিশাত। ঐ রকম করে নিঃশব্দে, মেলা রকম মনে হয় হাসতে পারে নিশাত।

তুমিই বলো এভাবে বলা যায়?

না যায় না। কিছুতেই বলা যায় না। আমার কণ্ঠ অনুকরণ করে নিশাত বলে উঠল।

নিশাত না হয়ে অন্য কেউ হলে ঠিক চটে যেতাম। বদলে যেন খুব উপভোগ করেছি এমনিভাবে হেসে ফেললাম সশব্দে। আর আমিও বললাম, না বলা যায় না। কিছুতেই বলা যায় না। তারপর প্রস্তাব কলাম, চলো, খাই।

খাই মানে?

বাইরে। কোনো রেস্তোরাঁয়!

নিশাত দুহাতে মানা করে উঠল। বলল, আমি কবে বাইরে খাই? তুমি জানো না?

আজকে।

উঁহু। না।

কী হবে?

বাসায় মেহমান আসবে।

তো আমি খাবো। তুমি বসে বসে দেখো।

আমি এ রকম যখন রাগ করে বসি, নিশাত কিছু বলে না–এটা অনেকদিন দেখেছি। একদিন ওকে একটা কলম কিনে দিলাম। নেবে না কিছুতেই। বললাম, না নেবে তো না। বলে কলমটা খুলে নিবটা ভেঙে ফেলব বলে হাত তুলেছি, খপ করে হাত ধরে ফেলল নিশাত। কেড়ে নিয়ে কলমটা ব্যাগে রেখে দিল বলল, নিলাম। আবার আরেকদিন আমার মেজাজটা কিসে বিগড়ে ছিল বলতে পারব না। নিশাতের সঙ্গে আলাপটা জমছিল না। ও একাই কথা বলছিল সারাক্ষণ। বলতে বলতে একবার শুনলাম, কই, কী হয়েছে তোমার? কিছু বলো। হঠাৎ কী হলো ঠাস্ করে বলে ফেলাম, কী বলব? তুমিই তো সব বলছ। বলেই বুঝতে পারলাম অন্যায় করেছি। ভয় হলো, নিশাত হয়ত এক্ষুণি উলটো হনহন করে হাঁটতে শুরু করবে। কিন্তু, তার বদলে হাসল নিশাত। যেন অন্ধকারে ফিক করে চাঁদ উঠল। নিজেকে খুব ছোট আর নষ্ট মনে হলো তখন।

চীনে দোকানে খেতে বসে দুজনের জন্যেই আনতে বললাম। নিশাত আমাকে বাধা দিল না। বেয়ারা পানির গ্লাস বেখে চলে যাবার পর ও আস্তে আস্তে বলল, আমি, কী যে আমি, মানে আমি না করব না।

অবাক হয়ে বললাম, কী ব্যাপার?

জানোই তো।

তখন ঝুঁকে পড়ে বললাম, জানিই তো, আমি খাবো আর তুমি বসে বসে দেখবে, সে হতেই পারে না।

তখন নিশাত চোখ নামিয়ে বলল, সেটা নয়। আমাদের বিয়ের ব্যাপারটা।

ওহো।

যেন হোঁচট খেলাম। খুব বিব্রত মনে হলো নিজেকে। আমি কিনা ভাবছি, ছিঃ। নিজের বুদ্ধিকে ক্ষমা করতে পারলাম না। একটুও না। আর খুব অবাক হলাম, নিশাত কী করে বুঝল, এই কথাটা ওকে বলার জন্যেই আজ সন্ধ্যে থেকে আমি তৈরি হয়ে আছি। শুনেছিলাম মেয়েরা নাকি ছেলেদের চোখ দেখে সব বুঝতে পারে।

বললাম, আমিও তাই ভাবছিলাম।

বেশ তো। বলল নিশাত। তখন ধোঁয়া ওড়ানো সুপ এলো সমস্ত ঘ্রাণ আচ্ছন্ন করে। পেটের ভেতরে চচন করে উঠলো খিদে। ন্যাপকিন দিয়ে খামোকা ঠোঁট মুছে ওর পেয়ালা নিয়ে চামচে চামচে তুলে দিতে লাগলাম সুপ। নিশাত বলল, থাক, আর না। তুমি নাও।

ব্যস?

অনেক।

বললাম, তুমি সব দেখে শুনে নাও। একটু নুন লাগবে। ঐটা নিয়ে না বড়ড ঝাল। আমি আজ সন্ধ্যে থেকেই ভাবছিলাম, বুঝলে।

আর আমি কদিন থেকেই বুঝতে পারছিলাম, যেন কিছু একটা হবে আমার। এক চামচ মুখে দিয়ে ঠোঁটটাকে সঙ্কুচিত করে চুষতে চুষতে নিশাত আবার বলল, দূর, কী যে সব বলছি! দ্যাখো, দ্যাখো, ওরা কী সুন্দর গোল হয়ে বসেছে।

তাকিয়ে দেখি এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক, কাঁচা-পাকা চুলে ভর্তি মাথাটা, চোখে চশমা, গায়ে। শাদা হাওয়াই শার্ট। আর তাকে ঘিরে বসেছে এক–দুই –ছয় সাত –আটটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। ভদ্রলোক একবার এর আর একবার ওর মুখে তুলে দিচ্ছেন খাবার। গরম লাগছে, ছেলেটা মুখ বিকৃত করে ফিরিয়ে নিচ্ছে আর হেসে উঠছে তার ভাইবোনেরা। ভদ্রলোক চোখ তুলে তাকালেন, তখন টুক টুক করে মাথা গুঁজে খেতে লাগল যারা হাসছিল।

নিশাত বলল, আহা, ওদের মা নেই বোধ হয়।

বললাম, কিংবা মা আবার বাচ্চা হতে হাসপাতালে গেছে।

যেমন তোমার বন্ধুর বউটি বছর বছর যায়। নিশাত যোগ করল বিদ্রূপ করে।

যেন তুমি কত দেখেছ?

বাহ তুমিই তো গল্প করো।

আমার বন্ধুটি ঐ রকম। কাণ্ডজ্ঞান নেই। বাচ্চা হবে বছর বছর। যদি আমি বিয়ে করি, তো অনেকদিন ছেলেপুলে হবে না। নিশাত যদি ইউনিভার্সিটিতে আসতে পারে, আসার কথা হচ্ছে, তো ভালো। নয় স্কলারশিপটা নিয়ে যাক ও বিলেতে। আর আমি দুদিন পরেই জুনিয়র থেকে প্রমোশন পাবো। নিজের পশার জমে উঠতেও বছর দুবছর। তখন একটা ছোট্ট বাড়ি করব। একতলা। আজকাল কত লোকে বাড়ি করছে। আমারও হবে। তারপর ছেলে।

নিশাত জিগ্যেস করল হাসছ যে?

কই না।

বেয়ারা এসে পেয়ালাগুলো নিয়ে গেল আমাদের। কাঁটা চামচ সরিয়ে জায়গা করল। আমি একটা সিগারেট জ্বালিয়ে বললাম, তাহলে সামনের মাসে?

ভাইজানকে বলো।

আমি?

কেন? ভয় কিসের।

না, এমনি। আমার যেমন কপাল। তিনকুলে কেউ নেই তো। নিজের বিয়েতেও নিজেই ঘটক।

নিশাতকে খুব স্লান দেখাল তখন। হঠাৎ একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, আমি কী বলব? তোমার যেদিন ভালো মনে হয়।

ঠিক তখন আমার বুকের মধ্যে রিমঝিম করে উঠল সরোদের ঝঙ্কারের মতো। মনে হলো, আজকেই আমাদের বিয়ে। এখান থেকে উঠে গেলেই দেখতে পাবো, বাইরে আলো ঝলমল করছে, মেলা লোকজন এসেছে, গাড়ি এসেছে, কাজি সাহেব এসেছেন, শরীফ এসেছে, ফটাস ফটাস করে পাড়ার ছেলেরা বাজি পোড়াচ্ছে আর আমাকে নিয়ে যাচ্ছে ভেতর বাড়িতে। চোখের সামনে নিশাত বসে আছে, নিশাতকে আর দেখতে পাচ্ছি না। ঘরের মধ্যে সমস্ত মানুষ যেন স্বপ্নের ভেতর থেকে এসে সব বসে আছে, আর আমি বুঝতে পারছি না– কেন?

উঠে দাঁড়াল নিশাত। বলল, মেলা দেরি হয়ে গেল না?

নিশাত কিছুতেই স্কুটারে উঠবে না, বাস স্টপেজে কিউ দিয়ে দাঁড়াল। বাসটা যখন ছেড়ে দিল, আমি দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললাম, ভাবীকে বোলো যে সামনের মাসে। কেমন?

বাসটা জোরে চলতে শুরু করেছে। সরে দাঁড়াতে দাঁড়াতে শো করে বেরিয়ে গেল। হঠাৎ যেন প্রচণ্ড একটা শূন্যতা লাফিয়ে পড়ল পথের পরে। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের মতো বুকটা অকারণে হু হু করে উঠল আমার। চৌরাস্তার ল ল বাতিটা দপ্ করে সবুজ হলো। স্রোতের মতো চলছে স্কুটার, কার, বাস, রিকশা। আমি দাঁড়িয়ে আছি তখনো। আমার যেন কোথাও যাবার নেই।

এত হালকা লাগছে নিজেকে, এত খুশি, কিন্তু কোথায় যেন কিসের একটা মোচড়–সব অথচ কিছু নেই! দুটো লোক আমার দুদিকে ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে গেল সামনে, গিয়ে আবার হাত ধরাধরি করে তারা হাঁটতে লাগল।

একটা রিকশা এসে থামলো। যাইবেন সাব? উঠে বসলাম। যেন এই কথাটাই এতক্ষণ কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না যে আমার একটা রিকশা দরকার। তাকে নবাবপুর দিয়ে সোজা যেতে বলে পকেটে হাত দিয়ে দেখি–বুকটা ধ্বক করে উঠলো–আমি টাকা হারিয়েছি। না এ-পকেটে, না ও-পকেটে, আমার মানিব্যাগটা নেই।

২. বন্ধু-স্ত্রী রাঁধেন ভালো

বন্ধু-স্ত্রী রাঁধেন ভালো। ঘরে পা দিতেই রান্নাঘর থেকে তাঁর কণ্ঠ শোনা গেল, আজ এত দেরি যে?

দেরি কোথায়? রোজ তো এই সময়েই ফিরি।

আসলে দেরিই হয়েছিল। সন্ধ্যের পর ঘরে ফিরে আসা আমার বেশ পুরনো অভ্যেস– যখন থেকে কাজি সাহেবের জুনিয়র হয়েছি। প্রথম দিনেই তিনি বলেছিলেন, ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি দিয়ে বিদায় করে। আসল লেখাপড়ার শুরু তারপর থেকে। মাথাটা খুব সাফ রাখতে হবে। পড়তে হবে প্রচুর। ভালো ল-ইয়ারের সিক্রেট হচ্ছে স্টাডি অ্যান্ড শার্প মেমরি।

আমার একটা স্বপ্ন, বড় ল-ইয়ার হবো। পয়সা হবে। বাড়ি হবে। জাল–ঘেরা প্রশস্ত বারান্দায় থাকবে আরাম চেয়ার। বাড়ির সামনে রাস্তাটা হবে চওড়া আর রাস্তাটার নাম চিনবে সবাই একডাকে। কাজি সাহেবের যে পশার প্রতিপত্তি, তাতে এ সবকিছুই তিনি করতে পারতেন। তিনি পুরনো কালের মানুষ বলেই হয়ত করবার মন নেই তার। সেই পুরনো দোতলা, আগে ভাড়া থাকতেন, এখন কিনে নিয়েছেন। গাড়িটার বয়স কুড়ির কাছাকাছি, মাসের মধ্যে পনের দিন গ্যারেজে পাঠাতে হয়। বসবার ঘরে খাড়া নকশাপিঠ চেয়ারের আর বদল হলো না। দরজার পর্দা কেমন ভিজে ভিজে মলিন আর তার আসল

রংটা কোনদিন দেখেছি বলে মনেও পড়ে না। তবু তার পশারের কথা জানতাম। তাই তাঁর মতো হবার আশা করছি।

সন্ধ্যের পর পড়তে বসতাম। পুরনো সমস্ত কেসের রিপোর্ট। মনে রাখবার চেষ্টা করতাম, চাঞ্চল্যকর সমস্যাগুলোর সন তারিখ ঘটনা আর কোন কোর্ট, কোন হাকিম, কী রায়। আমার স্মৃতিশক্তি তেমন সক্ষম বলে মনে হয় না। কোনদিন কোনো কিছু স্পষ্ট মনে রাখতে পারিনি। কেবল ভাসা ভাসা এখান থেকে ওখান থেকে মনে থেকেছে। গেল বছরের হয়ত ঘটনা, কিন্তু সব সময় আমার ধারণা হবে, দুতিন বছর আগে হয়েছে। কতবার যে মাস ভুল করেছি, নাম ভুলে গেছি, একজনের বদলে আরেকজনকে ভেবেছি তার লেখাজোখা নেই। কাজেই আমাকে পড়তে হতো বারবার, কষ্ট করতে হতো মনে রাখবার জন্যে। রাত বারোটা একটা হতো রোজ।

ভেজানো দরোজাটা একটু হাত দিতেই দড়াম করে খুলে গেল। সুইচ টিপতেই পাণ্ডুর আলোয় স্নান হাসতে লাগল বালিশ, বিছানা, টেবিল, আলনা।

দরোজার কাছে শব্দ করে এসে দাঁড়ালেন বন্ধু-স্ত্রী। বললেন, খাবেন এখন? না, পরে।

জালাল?

জালাল আমার বন্ধুর নাম।

তার একটু জ্বর দেখলাম।

জালালের একটা না একটা ছোট অসুখ এ রকম লেগেই আছে। আজ সর্দি, কাল মাথাব্যথা, পরশু জ্বর। শীত পড়তেই শুরু করেছে। শুরু হবে সারা সিজন ধরে খুক খুক কাশি। জ্বরটা বোধ হয় তারই পূর্বাভাস। জামপারটা খুলে আলনায় রাখলাম।

বন্ধু-স্ত্রী জানালেন জালাল শুয়ে আছে। রাতে রুটি খাবে। তারপর দরোজার কাঠ ধরে মাথাটা ভেতরে ঝুঁকিয়ে আচমকা ঝরঝরে গলায় জিগ্যেস করলেন, কী ব্যাপার? আজ বড় খুশি খুশি যে।

কে, আমি?

তাকিয়ে দেখি, তিনি হাসছেন মাথায় কাপড় দিতে দিতে। বললাম, না, খুশি লাগছে আপনাকে। সন্দেহ হলো, জালালের বোধ হয় জ্বরটা মিছে কথা। আমার সঙ্গে ঠাট্টা হচ্ছে। এ রকম ঠাট্টা ইনি মন্দ করেন না। বিশেষ করে আমার সঙ্গে। দেখলে কে বলবে, অভাবের সংসার আর পাঁচ ছেলে-মেয়ের মা। যেন গল্পে পড়া সুয়োরাণীর সেবাদাসী- সারাক্ষণ হাসি মুখে, আর রসিকতার তুবড়ি। মন্দ লাগে না। একেকদিন আমিও খুব উৎসাহের সঙ্গে লেগে যাই ঠাট্টার কম্পিটিশনে।

বললাম, আমাকে তো খুশি লাগবেই। চোখ দেখান শীগগীর।

কেন?

টাকা তুলে নিয়েছে। শতিনেক। এই তো আধঘণ্টাও হয়নি।

পকেট মেরেছে?

হুঁ।

ইস। তিনশ? কী করে?

জানলে কি আর নিতে পারতো? কপাল খারাপ। আমি এত কশাসলি চলি।

লুঙ্গিটা আলনা থেকে নিয়ে চেয়ারের ওপর রাখলাম। দরোজা থেকে চলে গেলেন বন্ধু-স্ত্রী। তার মুখটা আমার চেয়েও অনুতাপে কালো দেখাল।

মুখ ধুয়ে বলে এলাম, আজ আর খাবো না। দাওয়াত ছিল। বলতে ভুলে গেছি।

এতগুলো টাকা হারিয়েও মনটা খারাপ নেই। অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে অবাক হলাম। যেন অনেক বড় কিছু একটা পেয়েছি। আনন্দে ভেতরটা আলো হয়ে আছে। নিশাত রাজি হয়েছে, তাই? আমি যেন জানতামই নিশাত রাজি হবে। না, সে আনন্দও নয়। কিছুতেই মনে পড়ছে না এ রকম একটা কিছু; কিন্তু। কী সেটা? অনেকক্ষণ ভাবলাম।

অনেকক্ষণ। তারপর হঠাৎ চমক ভাঙ্গল। দেখি, এতক্ষণ কিছুই ভাবছিলাম না। একেবারে শাদা, শূন্য নিরবলম্ব লাগছে নিজের অস্তিত্বকে।

আজ পানি আনতে ভুলে গেছি। উঠে দাঁড়িয়ে রান্না ঘরের কুঁজো থেকে জগ ভরে নিয়ে এলাম। ঘরের ভেতর থেকে জালাল ডেকে উঠল, কে?

আমি।

আবার নিস্তব্ধ হয় গেল রাত্রিটা।

আমি এখন মাসে চারশ থেকে পাঁচশ করে পাই। আর নিশাত কি তিন সাড়ে তিনশ পায় না? কলেজে লেকচারারদের মাইনে কত, আমার ধারণা নেই। নিশাতকেও কখনো বলতে শুনিনি। তাহলে দুজনে সাত থকে আটশই হ.ব। মন্দ কী? কজন আছে মাস গেলে ঘরে এতগুলো টাকা তুলতে পারে? বেশ চলে যাবে আমাদের সংসার। সংসার আর কী? আমরা দুজন শুধু। দুজনের আর কতই বা লাগবে? জমানো আছে পৌনে চার হাজার আমার। বিয়ের পর একটা বছর গেলে দুজনে অন্তত আরো হাজার চারেক জমাতে পারবো। ভাইজানের বাড়ির পাশের জায়গাটা তো খালিই পড়ে আছে নিশাতের নামে। সেখানে বাড়ি করতে পারব। বছর খানেক কষ্ট করতে হবে। তারপর এককামরা দুকামরা করে আস্তে আস্তে দালান তোলা যাবে। একটা কামরা হলেই থাকতে শুরু করা যাবে। এক তলা। ইংরেজি এল-এর মতো করে তুলবো। এ–এর ছোট মাথাটায় থাকবে আমার চেম্বার। আজকাল সুন্দর প্রিন্ট বেরিয়েছে, দোর–পর্দা করা যায়। সোফার রংটা

হবে ধূসর– বর্ষার আকাশের মতো। বেশ লাগে রংটা। একটা শার্ট কিনেছিলাম ঐ রকম– রংটা টিকল না। জাপানি ইম্পোর্ট বলেছিল।

কিন্তু নিশাত যে বলছিল ওর স্কলারশিপটা বোধ হয় হয়ে যাবে। বিলেতে দুবছর থাকতে হবে। আমার মনেই ছিল না। সেটা বরং আরো ভালো যাক ও বিলেত। ফিরে এলে নাম হবে। ইউনিভার্সিটির কাজটা হয়ে যাবে হয়ত তখন। দুবছরে আমিও অনেকটা গুছিয়ে বসতে পারবো। আজকাল উঁকিল বেড়েছে–কম্পিটিশন বড্ড টাফ।

বাতিটা খামোকা জ্বলছে। নিভিয়ে দিলাম। কাল আলোয়ানটা বার করতে হবে। শুধু চাদরে বেশ ঠাণ্ডা করে। ঠাণ্ডা পড়ছে। রাত বোধ হয় একটা। দূরে হঠাৎ মানুষ চলার শব্দ শোনা যাচ্ছে, একটা গানের কলি, হাসি। সেকেণ্ড শো থেকে ফিরছে বোধ হয়।

বুকের কাছে পা টেনে নিতেই নিশাতের মুখটা মনে পড়ল। ছবির মতো। অনেক বড়। সিনেমার পোস্টারে যেমন! অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম। আমি একটু হাসলাম। নিশাত হাসল। আমার চোখে পলক পড়ছে না। নিশাতেরও না। আমি একটু অন্যমনস্ক হয়েছি, নিশাত আর নেই।

আবার মনে করলাম নিশাতকে। ঐতো ওর চোখ দুটো, নাকের তরতরে রেখা, চাপা ঠোঁট, একটা গালে চুলের ছড়িয়ে থাকা। আবার নিশাতকে দেখতে লাগলাম তেমনি নিঃসাড় পড়ে থেকে, বালিশে মাথা কাৎ করে রেখে, বুকের কাছে দুপা দ–এর মতো টেনে।

আমাদের যখন বিয়ে হবে, তখন বালিশ থেকে মুখ তুলেই দেখতে পাবো ওর মুখ। পাশের বালিশে ঘুমে ডুবে আছে নিশাত। অন্ধকারে আচ্ছন্নের মতো, কী হলো আমার, মুখ তুললাম। হাত রাখলাম। জানি নেই, জানি বিয়ের পরে, তবু যদি থাকে।

হাসি পেল আমার। একেবারে উঠে বসলাম। ছেলেমানুষের মতো করছি আমি। সিগারেটের জন্যে হাত বাড়াতে যাবো হঠাৎ হাতটা জগের গায়ে লাগল। চট করে সামলে নিতে পেরেছি, নইলে ভেঙেই ফেলেছিলাম। হৃদপিণ্ডটা এখনো লাফাচ্ছে। আস্তে আস্তে সন্তর্পণে উঠে বাতি জ্বালতে যাবো, তখন—

তখন হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টির মতো মা-র কথা মনে পড়ল। আমার আর ওঠা হলো না। সমস্ত শরীরের ওপর দিয়ে অদৃশ্য ঠাণ্ডা পানির রেখা নামতে লাগল যেন। আমি অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ এক নিমেষে খুইয়ে বিহ্বল নির্বাক এক ভিখিরির মতো বসে রইলাম। যেন শরীর থেকে এক ধাক্কায় ছিটকে আলাদা হয়ে গেছে আমার আত্মা; কয়েক হাত দূর থেকে আমাকে সে দেখছে অসীম করুণার সঙ্গে।

নিশাত জানে না। নিশাতকে আমি মিথ্যে বলেছি। বাবা মারা যাবার পর মা-র বিয়ে হয়েছিল আবার। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে মা-র দ্বিতীয় বিয়ের কথা মনে পড়লেই মনটা গ্লানিতে, লজ্জায়, ছোট হয়ে যেত। যেন দোষটা আমারই। যেন এ লজ্জার কুলান হয় না পৃথিবীতে। যেন আমার মা যদি মরে যেতেন তাহলে খুব ভালো থাকতাম আমি। ছাব্বিশ

বছর দেখা হয় না, মরে যাওয়াই তো। নিশাতকে বলেছিলাম, আমার মা-ও মারা গেছেন ছোটবেলায়। আমি তখন অনেক ছোট। কিসসু মনে নেই।

অনেকদিন ভেবেছি, এ রকম তো কত হচ্ছে। কাঁচা বয়সে বিধবা হয়েছিলেন, মামারা ছিলেন না কেউ; থাকলেও কিছু হতো না, কারণ শুনেছি নানা ছিলেন বড় গরিব; আবার বিয়ে ছাড়া উপায়ই বা কী? চাচারা কেন মাকে রাখেননি, কোনদিন জানতে পারিনি। হয়ত তারা পছন্দ করেননি মাকে, বোঝা বইতে চাননি। অনেকবার মনে মনে রাগ করতে চেয়েছি চাচাদের ওপর, পারিনি; কেমন নির্জীব একটা মায়া হয়েছে বরং।

মা-র দ্বিতীয় স্বামী আমাকে একেবারে কাছে ঘেঁষতে দেননি। বিয়ের পর সেই যে গেছেন, আর কোনদিন আসেনওনি মা আমাকে দেখতে। এখন বুঝতে পারি, ছোটবেলায় সে অভিমানটা কত ছেলেমানুষের মতো করেছি; দ্বিতীয় স্বামীর ঘর থেকে প্রথম স্বামীর পুরনো সংসারে কেউ আসে না–থাক না যতই মায়ার টান–এই সাধারণ কথাটা তখন বুঝিনি। আর মা–র কথা মনেই নেই যে মনে করে কোনো কিনারা হবে। কেবল একটা অবোধ আকুতির মতো, কিছুতেই মনে না পড়া স্বপ্নের মতো, অস্পষ্ট কম্পিত বহু দূরের অনুভূতির মতো মা–র অস্তিত্ব টের পেতাম। এই পৃথিবীর কোনখানে তিনি আছেন। একেক সময় স্পষ্ট দেখতে পেতাম যেন, গ্রামের মধ্যে টিনের বাড়ি একটা, সামনে আঙ্গিনা, আঙ্গিনায় হলুদ খড় শুকোতে দেয়া হয়েছে, কামলা বসে হুঁকো খাচ্ছে, গরু–ছাগল মাটিতে মুখ রেখে ঘুরছে আর চড়া রোদ উঠেছে আকাশ পুড়িয়ে–চারদিক খা খা করছে। তার মধ্যে মা কাজ করছেন। আমার কল্পনায় তাকে দেখতে পেতাম, ট্রেন থেকে গ্রামের একেকটা আঙ্গিনায় হঠাৎ হঠাৎ যেমন নীল তাঁতের ময়লা শাড়ি পরে, মাথায়

কাপড় তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে, কী উপুড় হয়ে কাজ করতে, বা গাড়ির শব্দে মুখ ফেরাতে বৌ-ঝিদের দেখা যায়। তাদের আলাদা করে মনে থাকে না, সব মুখ এক হয়ে যায়–সেই কালো শ্যামল রং, দুঃখী, নির্বাক। দেখতে পেতাম, যেন তার চারদিকে কালো কালো ন্যাংটো কী ছেঁড়া প্যান্ট পরা, ধুলো মাখা, নাকের সর্দি গালে চট চট করতে থাকা অনেকগুলো ছেলেমেয়েকে। তাদের পেট ফুলে উঠেছে, হাতে একটা আম, ভন ভন করছে মাছি– চকচকে চঞ্চল চোখে তারা আমাকে দেখছে।

বাতিটা আর জ্বালানো হলো না। সিগারেট খেতে চেয়েছিলাম। থাকগে। সিগারেটের দাম আবার বাড়িয়ে দিয়েছে। ট্যাক্স, ট্যাক্স আর ট্যাক্স। এক বছরে কটা ক্যাবিনেট ভাঙলো আর হলো? একটা স্টেবল গভর্ণমেন্ট চাই। আমার কিসসু হবে না। একটা লাইন করতে পারতাম, একটা যোগাযোগ থাকতো কোথাও এক মাসে আমারও বাড়ি হতো ধানমণ্ডিতে, গাড়ি হতো, টাকা আসতো বন্যার মতো। ঐ বাড়িগুলোতে কারা থাকে? অমন সুন্দর বাড়ি। আমার বাবা যদি মিনিস্টার হতেন, বেশ হতো। উঠে বসে আবার খুঁজতে হলো সিগারেট। ধরাবার পর মনে পড়ল, একটু আগেই খাবো না ভাবছিলাম। আজ আমার কোনো কিছুই মনে থাকছে না।

জানালার পাট খুলে দিতেই ঝলক দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে এসে পড়ল। বেশ লাগছে শীতটা। নিশাতের কথা ভাবছিলাম। নিশাতকে সুন্দর দেখতে পাচ্ছি, যেন বাতি জ্বালিয়ে ফটোগ্রাফ দেখা হচ্ছে। আর মা–কে।

একেকদিন হুহু করত মনটা–খুব যখন আনন্দ হতো, তখন। তখন সব আনন্দকে ব্যথায় মুচড়ে দিত মায়ের স্মৃতিটা। চমকে উঠতাম তখন। মনে হতো, আমার কথা শুনে মা খুব খুশি হতেন। ম্যাট্রিক যেবার পাশ করলাম, এত খারাপ লাগল। একটা গরম কোট ভালো ফিট করেছিল আর মানিয়েছিল চমৎকার হলে থাকতাম তখন–তীরের মতো মা–র কথা মনে পড়ল। আরেকদিন স্টেশনে একটা পরিবারকে আপার ক্লাশ ওয়েটিং রুমে ঢুকতে দেখলাম বাচ্চাগুলো এত সুন্দর আর চঞ্চল আর লাফাচ্ছিল—-আমার মুখটা হাসিতে ভরে গেল, তখন মনটা খুব খারাপ করল হঠাৎ।

আশ্চর্য! কতবার আমার জ্বর হয়েছে, কই মাকে একটুও মনে পড়েনি। আমার রুমমেট একটু অসুখ হলেই খালি বাড়ি যেতে চাইতো মাকে দেখতে। এম.এ. পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হলো, তখনো না। আশ্চর্য নয়? দুঃখের সঙ্গে কোনো যোগ নেই আমার মা–র। অথচ মাকে যখনি মনে হয়েছে, যেন চোখে দেখতে পেয়েছি দুঃখী, মলিন এক মহিলা জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

ঘুম থেকে উঠে দেখি বেলা আটটা বেজেছে। খচ খচ করছে দুচোখ এখনো। মনে হচ্ছে, আরো খানিকটা ঘুমোলে ভালো লাগত। কিন্তু নটার মধ্যে না পৌঁছুলে কাজি সাহেব রাগ করবেন। বলবেন, আমি কটায় উঠি জানো? পাঁচটা। পাঁচটায় তোমাদের মাঝরাত হয়।

রুমির কথা মনে পড়ল অহেতুক। আর তক্ষুণি মনে হলো, কাজি সাহেবকে দিয়ে নিশাতের ভাইজানের কাছে প্রস্তাব পাঠাবার কথা ভাবছিলাম। সেটা খুব সহজ হবে না। খুব অস্বস্তি লাগল। জালালকে পাঠাব? মন্দ হয় না। কিন্তু কাজি সাহেব তো আজ হোক

কাল হোক জানতে পারবেনই। রুমির জন্যে কাল্পনিক ভয়টাকে প্রশ্রয় দেবার কোনো মানেই হয় না। আমি একেক সময় এমনসব কাণ্ড করতে পারি। কাজি সাহেবকেই বলব। বরং তাকে পাঠানোই সবদিক দিয়ে সুন্দর হবে। আমার সিনিয়র, নাম আছে, গাড়ি আছে। বিয়ের প্রস্তাব, একটু আভিজাত্য হলে চমকার মানায়।

আজ নিশাতকে কলেজে টেলিফোন করে বলতে হবে। ভাবতে ভাবতে খুব হালকা লাগল ভেতরটা। নিশাতের সারারাত কেমন করে কেটেছে সেইটে কল্পনা করতে ডুবে গেল আমার মন। টুথ ব্রাশে পেস্ট লাগালাম, ঠাণ্ডা পানিতে আমার চোখ থেকে ঘুম ধুয়ে গেল, জালালের ছেলেমেয়েরা পড়তে না বসার দরুণ বকা খাচ্ছে, জালাল আমার হাতে খবর কাগজের ভেতর শীটটা দিল, চায়ে একটা পাত ভাসছে, সেটাকে চামচে কিছুতেই তুলতে পারছি না– সারাক্ষণ নিশাতের কথা মনে পড়তে লাগল। কাল এলোমেলো কী সব স্বপ্ন দেখেছি যেন একটা জায়গায় অনেকগুলো বেলুন উড়ছিল, তারপর আর মনে নেই। আবার দেখলাম সিনেমা শুরু হয়ে গেছে, আমি তবু বাইরে দাঁড়িয়ে আছি, কেন যেন ঢুকতে পারছি না, অথচ খারাপ লাগছে না একটুও, আমার যেন কোনো উদ্বেগই নেই। তারপর কী হলো জানি না। দেখলাম একটা গাড়ি মাঠের ভেতর দিয়ে খেলনা ট্রেনের মতো যাচ্ছে, কিন্তু কোনো শব্দ নেই, হুইসেল নেই, একজন প্যাসেঞ্জারও নেই– সবগুলো কামরা খালি।

জালাল জিগ্যেস করল, কাল তোমার পকেট কাটা গেছে শুনলাম।

আমি বললাম, সে এককাণ্ড শোনো, দাঁড়িয়েছি জিন্নাহ এভেনুতে... উৎসাহের সঙ্গে তাকে সবটা কাহিনী শোনালাম।

সে শুনে খেদোক্তি করল, তোমার মতো গাধা তো একটা দেখিনি। এত টাকা নিয়ে ভিড়ের মধ্যে যেতে আছে?

তখন বললাম, আরে শোন। তোমাদের বলাই হয়নি, আমি বিয়ে করছি।

কাকে? একসঙ্গে জালাল আর তার স্ত্রী জিগ্যেস করল, হঠাৎ খুশিতে লাফিয়ে ওঠা গলায়।

আবার কাকে? নিশাত।

আরে-আরে... ওরা কী বলবে বুঝতেই পারল না। এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। তারপর একসঙ্গে হেসে উঠল খামোকা।

বললাম, আর আমি কাল পরশু একটু দেশে যাচ্ছি। চাচাদের বলতে হবে না? অনেকদিন তো যাইনি, দেখিনি।

জালালের স্ত্রী বললেন, হ্যাঁ, যাওয়া উচিত। বিয়ের ব্যাপার, তারাই তো আগে জানবেন, আসবেন। কী বল? যেন এটা একটা মতামতের অপেক্ষা রাখে এমনি চোখে তিনি তাকালেন স্বামীর দিকে।

আমি হেসে বললাম, এতদিনে মনটা বেঁধেই ফেললাম। অনেক হলো! আর কত?

নাশতা শেষে ঘরে এসে একা দাঁড়াতেই বুকটা ভার হয়ে গেল আমার। মুখ ফিরিয়ে চোর চোখে দেখলাম বাইরে বারান্দায়। না, দেখা যাচ্ছে না কাউকে। ওদের কাছে তো আমি বলতে পারি না। আসলে আমি যাচ্ছি আমার মাকে দেখতে।

৩. স্বপ্নের মতো জ্যোছনা নেমেছে

স্বপ্নের মতো জ্যোছনা নেমেছে। ট্রেনের জানালা দিয়ে দেখা অস্পষ্ট গাছ আর বাড়িগুলো ক্রমাগত ঘুরছে, যেন একটা বাধনে আটকা পড়ে গেছে ওরা এই বিশ্বের সঙ্গে। সে বাঁধন কিছুতেই আর খোলা যাচ্ছে না। তাই বারবার, গ্রামে গ্রামে, অন্ধকারে অন্ধকারে ফিরে আসছে, গাছ, আবার গাছ, বাড়ি, আবার বাড়ি।

চীনে দোকানে যখন খাচ্ছিলাম আমরা, নিশাত বলছিল, আমার মা থাকলে খুশি হতো। ভাইজানও হবেন।

বিকট হুইসিল দিল আমাদের ট্রেন। গলা বাড়িয়ে দেখি ব্রীজ আসছে। জ্যোছনার মধ্যে অতিকায় একটা খেলনার তো দেখাচ্ছে। এইতো নিচে ছবির মতো দুধে ভরা নদী, নদীর পরে একটা কালো নৌকা, এতটুকু। উদ্দাম শব্দ উঠছে। রাতের স্তব্ধতা খানখান করে লোহার কড়ি বরগায় প্রতিধ্বনি তুলে, দার করে চলেছে আমাদের ট্রেন। একটা শূন্যতার মধ্য দিয়ে যাত্রা ওপরে স্বচ্ছ আকাশ, নিচে অতল নদী, আকাশটা স্বচ্ছ আর ভঙ্গুর, আর কাছে অথচ দূরে, যেন হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারবো, লাফিয়ে উঠলে পৌঁছে যাবো বেহেশতের দরবারে।

আমার তখন ভয় করল খুব। যেন পড়ে যাবো। আমাদের ট্রেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘুরতে ঘুরতে তলিয়ে যাবে নদীর অতলে।

মা-র সঙ্গে আর দেখা হবে না আমার।

সড়াৎ সড়াৎ করে সরে যেতে লাগল প্রতিধ্বনিগুলো, পিছিয়ে যেতে লাগল। চাকার নিচে আবার মাটির স্পর্শ বুঝতে পারছি। আবার দুপাশের থোকা থোকা অন্ধকার–মানে গাছ, সবুজ বাতি, আশেপাশে আরো অনেকগুলো লাইন, চিকচিক করছে, জীবন্ত স্রোতের মতো ওরা সচল, মন্থর হয়ে আসছে আমাদের ট্রেন।

আসলো। যেন প্লাটফরমে নামলেই দেখতে পাবো মাকে। উৎসুক হয়ে জানালার বাইরে তাকাতেই বুকের ভেতরটা থমথম করে উঠল আমার। এ যে কী অনুভূতি না ভয়, না আনন্দ, না বেঁচে থাকা, না কিছু। কিছু না, এবং একসঙ্গে সবকিছু।

নিশাত আমার বউ হবে এই আনন্দটার মতো স্পন্দিত বিশাল যেন আর কিছু হয় না। সে রাতে শুয়ে শুয়ে আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছিল। যেন এক্ষুণি একটা বিকট চিৎকার চিরে ফেলবে আমার হৃদয়টাকে।

আমার সমস্ত কিছু যেন আরেক জীবনে, অন্য কারো জীবনে ঘটে গেছে। অতীতের কিছুই আমার নয়, তবু সেই অতীতটা দুঃসহ বেদনার মতো পাকিয়ে পাকিয়ে, মৃত্যুমুখে অজগরের মতো আছড়াতে আছড়াতে আমার ভেতরে মাথা কুটে মরছে।

কুলির মাথায় সুটকেস দিয়ে পথ জিগ্যেস করে পথ চলতে শুরু করলাম। কিছুক্ষণের জন্যে জ্যোছনা ঢাকা পড়েছে শাদা মেঘে। আমার খুব শীত করছে। জাম্পারটা পরেছি, তবু।

কে জানে কীভাবে আমাকে ওরা নেবে। চিঠি লিখে দিয়েছিলাম। কাজেই আচমকা হাজির হবার নাটকীয়তা থেকে বাঁচা গেছে। তবু ছাব্বিশ বছরের ব্যবধান কি সহজ হয় এত সহজে? মাকে আমি বলব নিশাতের কথা। আমার ওপরে কেউ নেই, আমার অপেক্ষা করতে হবে না কারো মতামতের। তবু স্বাধীনতা শূন্য ঠেকল, নিশাত যখন বলল আমার বউ হবে। কেউ থাকুক যার কাছে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে আমি বলতে পারি–এই করছি, আমাকে নিষেধ করো যদি ভালো না লাগে; বলতে পারি–আমাকে দোয়া করো, যদি ভালো মনে হয়।

সেদিন সারারাত মা-র কথা আমার মাথায় ঘুরেছে অন্ধ একটা পাখির মতো, কিন্তু বুঝতে পারিনি। সকালে যখন উঠলাম তখন চোখ খচখচ করছিল। কাজি সাহেবকে দিয়ে প্রস্তাব পাঠাবার কথা, তাঁকে বলা হলো না। নিশাতের সঙ্গে বসে বিস্তারিত আরো অনেক কিছু কইবার শোনবার কথা, তাও হয়নি। সবার চেয়ে বড় হয়ে, বড় করে দেখা দিলেন আমার মা। যেন তাকে যতক্ষণ না বলতে পারছি, তার মতামত না শুনতে পারছি, তাঁর দোয়া না পাচ্ছি, ততক্ষণ আমার আর স্বস্তি নেই।

দেখা হলো অনেক পরে। অন্ধকারের ভেতরে বসে থাকতে থাকতে যখন আমি আর বুঝতে পারছিলাম না আমার জীবন্ত অস্তিত্বকে, তখন মা এসে দাঁড়ালেন আমার স্বপ্নের ছবিকে খানখান করে।

বাড়ির সামনে বিরাট আঙ্গিনা। একপাশে পুকুর। ঘাটে শান বাঁধানো বসবার জায়গা। চৌচির হয়ে ফেটে আছে, আর ভেতরে শুয়ে আছে কালো রেখার মতো অন্ধকার। পুকুর থেকে উঠে আঙ্গিনা পেরিয়ে বাড়ির দিকে মুখ করলে বড় বড় চালাঘর চোখে পড়ে। খড়ে ভর্তি। গন্ধটা সুন্দর। খসখস করছে। ভূতের মতো শুয়ে আছে তার পরে লোক।

এরকম দুটো চালার পরে কয়েকটা মাথা ঝকরা আম গাছ। সেই গাছের ফাঁক দিয়ে গেলে ভেতর–বাড়ি।

প্রথমে যাকে দেখলাম, আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল। ছাব্বিশ বছরের ব্যবধান এক সেকেণ্ডে দৌড়ে পার হয়ে যেন মার সামনে দাঁড়ালাম। আমার মাথার ভেতবটা ঝিমঝিম করতে লাগল, স্মৃতির মধ্যে বুককাঁপানো ট্রেনের হুইসিল শুনতে পেলাম। কিছু বলতে পারলাম না। সে আমার মুখের কাছে হারিকেন তুলে নিঃশব্দে নিরিখ করতে লাগল। কথা বলল না, নড়ল না; স্তম্ভিত সময়ের মধ্যে আমরা দুজন দাঁড়িয়ে রইলাম।

অবিকল যেমন আমি ভেবেছিলাম। সেই দুঃখী, নির্বাক, মলিন মুখ। অবিকল সেই নীল তাঁতের ময়লা শাড়ি পরনে, মাথার পরে একটুখানি ঘোমটা, খালি পা, রূপোর হাঁসুলি গলায়, শিথিল, শ্যামল, পুঞ্জীভূত অবোধ মমতার মৃত রেখায় গড়ে ওঠা একটি মুখ।

হারিকেনের নিস্তেজ আলোয় যেন আরো কাছে দেখাচ্ছে তাকে। যেন আরো করুণ হয়ে উঠেছে তার অস্তিত্ব।

আমি একটা কিছু বলতে যাবো, ঠিক তখন সে হারিকেনটা নামিয়ে চলে গেল বাড়ির মধ্যে। এতক্ষণ যে আমগাছগুলোর কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম আবার তারা সহাস্যে অন্ধকারে আমার বন্ধু হবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠল। কুলিটাকে বিদেয় করলাম আমি।

তারপর আবার এলো সে। বলল, কী বলল অস্ফুট কণ্ঠে আমি বুঝতে পারলাম না। আমার সুটকেশ পড়ে রইলো বা পাশে একটা বড় টিনের ঘরের দাওয়ায়। সেদিকে আমি হাত বাড়াতেই শুনলাম, থাইক। আনবনে। আমি তার পেছনে চললাম। যেন আমি পায়ে পায়ে এক অন্ধকার থেকে আরেক অন্ধকারের ভেতর দিয়ে আমার ছোটবেলায় ফিরে যাচ্ছি। যেন আমি আগেও কতবার এসেছি এ বাড়িতে, যদিও সত্যি তো আমি কোনদিন আসিনি। যেন এইবার আঙ্গিনা থেকে ভেতর-আঙ্গিনায় যাওয়া, খড়ের দুর্মর দুর্বোধ্য সুবাস, পাতার মধ্যে থোকা থোকা অন্ধকার, দূরের থেকে থেকে হারিয়ে যাওয়া, কাউকে হাটের পথে ডেকে ডেকে ফেরা, ঐ হারিকেনের চলমান আলো, পায়ের নিচে তকতকে মাটি-সব আমার চিরদিনের চেনাশোনা। দূরে দূরে, আঙ্গিনায় চারদিকে থমথমে বাতি নেভা ঘরগুলো, তাদের চালে তারা ও জ্যোছনার অস্পষ্ট বার্নিশ -দুপা এগোতেই ওপাশে অন্ধকারের মধ্যে গণগনে চুলোর লাফানো আগুন আর কাঠ পোড়ার পটপট শব্দ, কয়েকটা মুখ তাকাল আগুনের পটভূমিতে আমার দিকে।

বারান্দায় উঠে একটা চেয়ার দেখিয়ে সে বলল, বসেন। আম্মা আসতেছে।

আমি চোখ তুলে তাকালাম। বুঝতে পারলাম, আমি ভুল করেছি। এতে আমার মা নয়। স্বস্তিতে সুন্দর লাগল ভেতরটা। এতক্ষণ যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করেছিলাম, নিঃশ্বাস পড়ল।

হারিকেনটা নামিয়ে রেখে গেছে। তার আলোয় পায়ের কাছটা আলো হয়ে আছে আমার। ভারী অচেনা লাগছে। অপলক তাকিয়ে আছি আমার জুতোর দিকে। জুতোর দুপাশে কাঁচা এঁটেল মাটি লেগেছে, অদ্ভুত দেখাচ্ছে, যেন আর কারো জুতো পরে বসে আছি আমি।

অনেকক্ষণ পরে একটা অব্যক্ত মৃদু ধ্বনি উঠল আমার পেছনে। অন্ধকারের ভেতর থেকে। আমার সমস্ত পিঠে ছড়িয়ে পড়ল উজ্জ্বল আলো। তাকিয়ে দেখলাম, প্রথমে সেই যে আমাকে হারিকেন দেখিয়েছিল সে তার হাতের আলো তুলে ধরে আছে, তার আলো যাকে আলোকিত করে তুলেছে তাকে স্বপ্নেও আমি কোনদিন দেখিনি।

আমার মা।

না বিস্ময়, না ভীতি, না কিছু। চেনাও মনে হলো না, অচেনাও নয়। দূরেও না, কাছেও না। সারা অঙ্গে ঝলমল করছে অলঙ্কার। পদ্মপাড় শাড়ি পরনে। শাদা। অত্যন্ত ফর্সা, আর ভারী, থলথলে একটি মুখ। ঠোঁটের পরে খয়েরি রেখা পানের।

আমি কদমবুসি করলাম। নিঃশব্দে তিনি সেটা গ্রহণ করলেন। তারপর নির্লিপ্ত কণ্ঠে অনাবশ্যক প্রশ্ন করলেন, কখন আসছ?

এইমাত্র।

ভালো আছো না?

জি।

ঢাকা-ই থাকো?

হ্যাঁ। ওখানে ওকলতি করি।

বাসা নিয়া?

জি–ঐ আর কী–।

মা তখন পাশ ফিরে বললেন, ওরে পানি দিছাস? গামছাটা বাইর কইরা দে। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, ফিরোজার বাপ কইলো তুমি কাইল আইসবা।

একদিন আগে হয়ে গেল। আমি বললাম।

আইচ্ছা। তুমি বসো।

তিনি চলে গেলেন। আমি খুব আশ্চর্য হয়ে গেলাম। একটা ঝড়ের মতো দৃশ্যের অবতারণা হবে ভেবে রেখেছিলাম। কিন্তু তার বদলে দেখলাম ঠাণ্ডা, নিস্পৃহ, নিরাসক্ত একটি মানুষকে। তার সঙ্গে আমার রক্তের নয়, যেন লৌকিকতার সম্পর্ক। তার সঙ্গে কেবল কুশালাচার বিনিময় আর সাংসারিক উন্নতি-অবনতির সংবাদ ছাড়া আর কিছুই দেয়া নেয়া যেন চলতে পারে না। আমি তার ছেলে নই, অন্য কেউ, অন্য কোনো জন। এমন একজন, যাকে ভেতর বাড়ি পর্যন্ত আসতে দেয়া চলে, বারান্দায় তার বসবার আসন হয়, বাড়ির গিন্নী তার সঙ্গে এক-আধ মিনিট আলাপ করতে পারেন দরোজায় দাঁড়িয়ে। ঐ পর্যন্ত।

মনটা বিষিয়ে উঠল আমার। অনুতাপ হলো। কেন আমি আসতে গেলাম এখানে? কে আমাকে বলেছিল? কী দরকার ছিল। আমার যেন মনে হলো, যার সংগে এক মুহূর্ত আগে খুচরো আলাপ করলাম, তিনি আমার মা নন। আমার মা আছেন অন্য কোথাও, অন্য কোনো গ্রামে। এখান থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে যে-কোনো দিকে কয়েক মাইল হেঁটে গেলেই তার দেখা পাবো; যিনি দেখা হলে আমাকে কিছুই বলবেন না। কোনো কথা হবে না, এবং আমার মনে হবে, আমি তাঁর দেখা পেয়েছি।

আমি কিছুদিন থেকেই লক্ষ করছি আমার মনটা মাঝে মাঝে আমার হাতের বাইরে চলে যায়। সে যা খুশি তা করতে থাকে, তার খেয়াল খুশি নির্বিবাদে অনুগত ক্রীতদাসের

মতো তামিল করে আমার জীবন্ত দেহটা, আমি কিছু করতে পারি না। যেমন, আমি যখন রাগ করি, তখন হয়ত রাগতে মোটেই চাই না। যখন একজনকে ভালো লাগে তখন আসলে হয়ত তাকে ঘৃণা করতেই চাই। এ এক অদ্ভুত টানাপোড়েন। এর কিসসু বোঝা যায় না। রুমিকে দেখলে আমার গা শিরশির করে; শিউরে উঠি, কিন্তু হেসে কথা বলি। আদালতে যে আসামির ওপরে অসীম করুণা হয়, তাকেই নিষ্ঠুর তরবারির মতো জেরার আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত, অবসন্ন, পরাজিত করি। অথবা বিয়ের কথা বলব নিশাতকে, আমার মনের মধ্যে এক দ্বিতীয় মন কেবলি আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, ছুঁতো খুঁজে দেরি করিয়ে দেয়। শিশিরে ভেজা ঢিলে-ঢালা ঘুড়ির মতো শিথিল ঠেকছে ভেতরটা। এ কোন অচেনা এসে দাঁড়াল আমার সমুখে মা বলে? যেন যাবার জন্যে, আমি উঠে দাঁড়ালাম।

সেদিন রাত্তিরের মধ্যে অনেকের সঙ্গে আমার দেখা হলো। মা, মার দ্বিতীয় স্বামী খোরশেদ সাহেব, তার আগের পক্ষের বিধবা বড় মেয়ে ফিরোজা আর তার ছেলে রিয়াজ; এ পক্ষের আমার সৎ ভাই-বোন আটজন। একে একে তারা এসে দাঁড়াল আমার সমুখে। চোখে তাদের অনিশ্চয় সন্দেহের ঠাণ্ডা দ্যুতি, দ্বিধার থরথর হাওয়া। বোনগুলো ছোট ছোট; তাদের গায়ের নীল কী হলুদ একরঙা কী ছোট ছোট প্রিন্ট ফুল করা জামা থেকে উঠছে জ্বালাকর গন্ধ, মুখে গৃহপালিত জন্তুর ছায়া। তার মধ্যে একজনের মুখ অবিকল আমার মতো। তার নাম জিগ্যেস করলাম, বলল না। পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। যেন বুঝতে পারল না আমার কথা। ওদের বাবা তখন বললেন, অর নাম নীলা।

খানিকক্ষণ গল্প করে উঠে গেলেন খোরশেদ সাহেব। তার বুকের মধ্যে জমে থাকা কাশির প্রবল উঠে আসবার চেষ্টা আর খড়মের আওয়াজ অন্ধকারকে ঠুকতে ঠুকতে চলে গেল। যেমন শুনেছিলাম ঠিক তেমনি এই মানুষটা। যতটুকু না করলে নয় মেহমানকে, তার বেশি কিছুই পেলাম না তাঁর কাছ থেকে। পেলে কি খুশি হতাম? তাই কি আশা করেছিলাম? কী জানি। এটুকু কেবল মনে আছে, আমার বড় ভয় করছিল। যেন আমি একটা বিরাট অপরাধ করেছি এবং যে-কোনো মুহূর্তে তিনি তার কৈফিয়ৎ চাইতে পারেন, শাস্তি দিতে পারেন। চলে যখন গেলেন, স্বস্তি পেলাম।

ফিরোজা এলো। এসে বলল, বিছানা কইরা দিছি।

তারপর হাতের লণ্ঠনটা রেখে বলল, শ্যাষ রাইতে ঠাণ্ডা পড়ে। গায়ে দেওয়ার কিছু আনেন নাই?

আমি বললাম, তাই নাকি? নাতো।

খ্যাতা দেই একখান? বলে সে চলে গেল, হয়ত কাঁথা আনতে। তখন সুন্দর লাগল ফিবোজাকে। ও আমার কেউ নয়, আমার মা-র রক্ত নেই ওর শরীরে, অথচ আমরা ভাইবোন। শরীরটা ঝিমঝিম করে উঠল, যেন কোথাও কিছু আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, প্রবল মায়া করছে ফিরোজার জন্যে। কয়েক ঘণ্টা আগেও যাকে জানতাম না, যাকে দেখিনি, সে-ই যেন কতবালের চেনা মনে হচ্ছে। শ্যামল মুখ ওর চিকচিক করছিল আলোয়। নিরাভরণ বাহু, কণ্ঠ, কর্ণমূল যেন হাহাকার করছে। মনে

হচ্ছে, ফিরোজার জন্যে কোন উপকার যদি আমি করতে পারতাম তো পরম শান্তি মিলতো।

পায়ের শব্দে ফিরোজাকে টের পেলাম। ভালো করে তাকাতে পারলাম না ওর দিকে। হাত বাড়িয়ে কাঁথাটা দিল ও। চুপ করে থাকা যায় না আর। বললাম, কে সেলাই করেছে? মা?

না, আমি।

চলে গেল না, দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়ে দাঁড়ি: হাসল নিঃশব্দে। বলল, আপনের কথা আম্মা একদিন কইছিল। আমি কই, বাঁইচা থাকলি একদিন দেখমু।

এলাম তো তাই।

রাইত হইছে, যাই।

আমার মায়ের জন্যে অবাক লাগছিল সবচে বেশি। এই যে মেয়েটা আমাকে কোনদিন দেখেনি, সেও কত আপন হয়ে উঠছে। অথচ মা এলেন না একবারও। যেন আমার আসা ফিরোজাদের জন্যে। দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে বুঝতে পারলাম ছাব্বিশ বছরে রক্তের সর্বশেষ ধারাটা নিঃশেষে শুকিয়ে গেছে, মরে গেছে বন্ধন, হারিয়ে গেছে স্মৃতি। এখন

আর কিছুতেই আমি তাকে কাছে পাবো না, না তিনি আমাকে। আমার চলে যাওয়াই ভালো।

ভাগ্যি ভালো নিশাতকে বলে আসিনি কোথায় যাচ্ছি। তাহলে তাকে আর মুখ দেখাতে পারতাম না। ইচ্ছে থাকলেও অবশ্যি বলা হতো না। কারণ, ওকে বলেছি, আমার মা নেই। নিশাত–ফিরে গিয়েই নিশাতকে ডাকতে হবে। ওর ভাইজানকে বলতে হবে। বিয়ের তারিখটা ঠিক করে ফেলতে হবে।

আসলে, মরে গেলেই ভালো ছিল আমার। মা যদি সত্যি সত্যি মরে যেতেন তো এই ভীষণ আঘাতটা আমাকে পেতে হতো না। অন্ধকারে শুয়ে আছি, এখন তো আর নিজের মনের কাছে কিছুই লুকোনো সম্ভব নয়। আমি খুব আহত হয়েছি মা–র ব্যবহারে। কিছুতেই মেলাতে পারছি না, কী করে এমন হতে পারে? ছেলেকে রেখেও নির্বিকার মুখ করে চলে যেতে পারে মা? নাড়ির সঙ্গে টান থাকে নাকি মায়েদের। মিথ্যে কথা। আমি শুধু কল্পনাই করতে জানি, বাস্তব যে কত নিষ্ঠুর তা বুঝি না। যে মাকে মনে মনে কতদিন দেখেছি, তার একেবারে বিপরীত ছবি দেখে তাহলে আমাকে এত কষ্ট পেতে হতো না। পাগলের মতো ঢাকা থেকে এতদূর ছুটে আসার মতো বোকামিও করতাম না আমি।

বরং ফিরোজাকে আমার আপন মনে হচ্ছে। কেন মনে হচ্ছে কে জানে? আমি চাই না, তবু। তাই আরো রাগ হচ্ছে নিজের ওপর, আমার মা–র ওপর। আক্রোশে আঙ্গুলের ডগাগুলো লাল হয়ে উঠছে। উঠে পায়চারি করতে ইচ্ছে করছে আমার। রাত্রির নিস্তব্ধতা

থেকে ঝি ঝি ডাকছে ঝিম-ঝিম ঝি-ঝি করে। থেকে থেকে একটা বাতাস দিচ্ছে। সারাদিন ট্রেন চলার ক্লান্তিতে নিস্তেজ নিরুৎসাহ লাগছে ভেতরটা। যেন আমি মরে যাচ্ছি। বা আজ রাতেই যাবো।

ফিরোজার কাছে মা আমার গল্প করেছিলেন বিদ্যুতের মতো মনে পড়ল কথাটা। কী বলেছিলেন যে, ফিরোজা ভেবেছিল, বেঁচে থাকলে আমাকে একদিন দেখবেই? হয়ত ফিরোজার ছেলে রিয়াজকে দেখে মনে পড়েছে আমাকে। হয়ত রিয়াজকে কোলে করে বসেছিল ফিরোজা, তখন আচমকা মা-র মনে হয়েছে আমার কথা। ফিরোজার যদি আবার বিয়ে হয়ে যায়, তাহলে রিয়াজ বড় হবে আমার মতো। তা কেন? নিজের ভাগ্য সবার কাঁধে চাপিয়ে দিতে চাইছি আমি। রিয়াজকে নিয়েই তো দ্বিতীয় সংসার করতে পারে ফিরোজা। হয়ত তারা খুশি হয়েই কোলে নেবে তাকে। মানুষ করবে নিজের ছেলের মতো। রিয়াজ কেন আমার মতো হতে যাবে? আমার মাথার কিছু ঠিক নেই। ফিরোজারই বা আবার বিয়ে হতে যাবে কেন? আমার মা ছিলেন গরিবের মেয়ে, রূপ ছিল, যৌবন ছিল হয়ত.-বোমার মতো বিপজ্জনক একটা বস্তু অভাবের সংসারে। তাই তার না হয় হয়েছে, ফিরোজার কেন হতে যাবে? আমাকে যদি দিত, আমি রিয়াজকে নিয়ে যাই ঢাকা। আমার কাছে থেকে পড়বে, বড় হবে। কাল বলব ফিরোজাকে? আশ্চর্য তো, ফিরোজা আমার কে?

এখানে, এ বাড়িতে আসবার পরমুহূর্ত থেকেই আমার মন যেন সহস্র চক্ষু হয়ে উঠেছে এইমাত্র সেটা টের পাচ্ছি। সব কিছুর মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি অর্থ, সব কিছুকে নিজের অংশ করে তোলার প্রচণ্ড টান বোধ করছি। যেন এমনি করে আমার ব্যর্থতা, ক্ষয়, স্মৃতি সমস্ত

কিছুর ওপরে গড়ে উঠবে অসামান্য সুন্দর সৌধ। আসলে সব কষ্টের মূলে রয়েছে মানুষের এই কষ্ট পাবার ক্ষমতাটা। আমার মন যদি পাথরের হতো, আমার চোখ যদি দৃষ্টির অতীতে কিছু না দেখতো, তাহলে চমৎকার দিন কাটতো আমার। কিন্তু কোথায় যে কবে কুড়িয়ে পেলাম এই স্বভাবটা ঘুরে ফিরে উলটে পালটে একটা ছবি, একটা মুহূর্ত, কী একটা অনুভূতিকে না দেখতে পারলে যেন শান্তি হয় না। নিশাত বলে, আমার আইন না পড়ে সাহিত্য কী দর্শন পড়া উচিত ছিল।

হয়ত আগাগোড়াই আমি ভুল করে এসেছি। জীবনে যা করা উচিত ছিল, যা করলে আমার সুখে সম্মানে দিন কাটতো, তা করিনি। ঝোঁকের মাথায় নিজেকে ছেড়ে দিয়ে মজা দেখার প্রবল ইচ্ছেটা যদি না থাকত, তাহলে আজ আমি আদৌ আসতাম না মাকে দেখতে। নিশাতকে যদি ভালো না বাসতাম তাহলে আসতাম না।

অথচ এমনিতে আমি খুব হিসেবি। অন্তত সবাই তাই বলে। জালাল এ নিয়ে আমাকে ঠাট্টা করে। জালালের বউ খোঁচা দেয়। নিজেকে যারা এমনি ক্রমাগত বিশ্লেষণ করে চলে তাদের কি সতর্ক পুরুষ বলে? বলে হিসেবি লোক? বৈষয়িক লোক?

মা-র ছবিটা কালো মনে হচ্ছে। মনটা খুব খারাপ। যে মহিলাকে দেখলাম ভরা মুখ, অলঙ্কারে আভরণে সম্ভ্রম ছড়ানো, ফর্শা তার সঙ্গে কিছুতেই মেলাতে পারছি না ছাব্বিশ বছর আমার স্বপ্ন-জাগরণে দেখা মাকে। খোরশেদ সাহেবের স্ত্রী হিসেবে তাকে কোনদিন ভাবতে পারিনি বলেই কী এই কষ্ট আমার? এই ছবি না মেলার দুঃখ?

কাল সকালেই চলে যাবো। এই সিদ্ধান্তটা নেবার সঙ্গে সঙ্গে মনের সমস্ত মেঘ যেন কেটে গেল, ভালো লাগল ভেতরটা। শীত শীত করছে। ফিরোজা ঠিকই বলেছিল। কথাটা টেনে নিতেই পুরনো সুতোব আচ্ছন্ন করা ঘ্রাণে ঘুম এলো। যেন পুরনো রোদ–বৃষ্টির গন্ধ সঞ্চিত হয়ে আছে এই কথাটায়। টুপটাপ করে শিশির পড়তে শুরু করেছে। চাঁদ ডুবে গেছে অনেকক্ষণ।

ঘুমের মধ্যে মনে হলো সুন্দর রোদের মধ্যে গা খুলে বসে আছি আমি। খুব আরাম লাগছে। হাত পা টান–টান করে ছড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করছে। চোখ মেলে দেখি, সেই মুখ, সেই অলঙ্কারের শব্দ, ফর্সা চাঁদের মতো। আমার মা।

চমকে উঠে বসতেই একেবারে বুকের মধ্যে পড়লাম গিয়ে তার। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন। হাত বুলোতে গিলেন মাথায়, চুলের ভেতরে, আমার পিঠ ঘষতে লাগলেন যেন প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে আমার ওখানে।

সমস্ত ব্যাপারটা ঘটলো এক পলকের মধ্যে। আমার ঐ রোদের আমেজ থেকে তার কান্না পর্যন্ত। হতবাক হয়ে পড়ে রইলাম আমি। যেন স্বপ্ন দেখছি, আর কিছু না।

তারপর আস্তে আস্তে বোধ ফিরে এলো। টের পেলাম, রাত এখন অনেক। চোরের মতো মা এসেছেন আমার ঘরে। খুব করুণা হলো তাঁর জন্যে। ছাড়িয়ে নিলাম নিজেকে। তখন ফিসফিস করে মা জিগ্যেস করলেন, গ্যাদা আইছস ক্যান?

কী জবাব দেব এর? মা আবার নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন। এত দূর মনে হলো তাকে যে বাধা দিতে পারলাম না। তিনি আবার জিগ্যেস করলেন, টাকা পয়সা দরকার? কয় ট্যাকা?

না, না।

আমি বিব্রত হয়ে পড়লাম তাঁর কথা শুনে। তিনি কি মনে করেছেন, টাকার দরকার পড়েছে বলে আমি এসেছি? পৃথিবীতে এত কথা, এত কারণ থাকতে, আমার মার কেন মনে হলো টাকার কথা? বোকার মতো তাকিয়ে রইলাম তাঁর দিকে।

অন্ধকারে তাঁর মুখ দেখা যাচ্ছে না ভালো করে। চৌকির পর আধো উঠে বসেছেন, কোলে লুটিয়ে পড়েছে আঁচলটা। অদ্ভুত অর্থহীন কয়েকটা ভাজ সৃষ্টি হয়েছে আঁচলে। আমার চোখ স্থির হয়ে রইল সেখানে। যেন সমস্ত কিছুর ব্যাখ্যা লুকানো রয়েছে, আমার দৃষ্টি ওখানে খুঁজছে সেই চাবিকাঠি।

বললেন, ফিরোজার বাপ কত রাগ কইলো। কয়, ছাওয়াল আইছে ক্যান? কী চায় তারে জিগ্যাস করো নাই?

আমি কী ক্ষতি করেছি খোরশেদ সাহেবের যে তিনি না দেখেই আমার শত্রু হয়ে আছেন বুঝতে পারলাম না। মাত্র কয়েক ঘণ্টা হলো এসেছি, এর মধ্যে এত কথাই বা কখন

হলো, তাও ঠাহর করতে পারলাম না। মনটা বিষিয়ে উঠল। তেতো গলায় বললাম, সে কথা তিনি জিগ্যেস করলেই পারতেন।

চুপ করে রইলেন মা। একটা নিঃশ্বাস পড়ল তাঁর। বললেন, তার মাথার উপর কত ঝামেলা–এত বড় সংসার যে কী কইরা চালায় তা সে জানে আর উপরে আল্লাহ জানে। আমার কথার পিঠে এ কথার মানেটা স্পষ্ট হলো না। আরো রোখ চেপে গেল আমার। দাতে দাঁত চেপে বললাম, টাকার দরকার, ছি-ছি, তাই হলে আপনার কাছে আসতাম না, ছাব্বিশ বছরে একটা খবর নিয়েছেন আপনি আমার? আপনাকে মা বলে কে? যান আপনার ছেলে–মেয়েদের কাছে। লজ্জা করে না লুকিয়ে আসতে? ভালো মানুষী দেখাতে?

আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না, কী ধরনের পরিস্থিতি হলে মানুষ তার মাকে এ রকম কথা বলতে পারে। আমি যদি নিজেই একথা শুনতাম, হেসে উড়িয়ে দিতাম একটা অলীক গল্প বলে। কিন্তু জীবনটা অলীকের ঊর্ধ্বে, অসম্ভবের হাতে, এক দুর্বোধ্য ঘটনা–প্রবাহ ছাড়া তো আর কিছুই নয়। তাই জীবন নতুন নতুন চমক দিতে পারে আমাদের।

মা তখন আবার নতুন করে কাঁদতে বসলেন। কঁদতে কাঁদতে উঠে দাঁড়ালেন অনিশ্চিতভাবে। তার কান্নাটাকেও মেকি মনে হচ্ছে আমার। মনে হচ্ছে, নিজের জন্যে নয়, আমার জন্যে নয়, এক অর্থহীন অভিনয়ের অঙ্গ হিসেবে কেঁদে চলেছেন তিনি।

কিন্তু আসলে আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেছি। ওরকমভাবে কথাগুলো না বললেই পারতাম। কাল সকালেই তো চলে যাবো, কী লাভ হলো মনটাকে তেতো করে? আরেক

মুহূর্ত হলে হয়ত আমিও উঠে দাঁড়িয়ে তার হাত ধরে ক্ষমা চাইতাম, কেঁদে ফেলতাম। চোখে পানি এসে গিয়েছে আমার টের পাচ্ছি। তার আগেই মা বললেন, মাইনষরে শান্তি দিলি না তুই। তুই তো কবিই। তুই কবি না? বাপেরে জানে মারলি, সে সম মনে আছিল না? এখন আইছস মায়ের জল্লাদ হইয়া? যে কথা কাউরে কই নাই, তাই আমি আইজ চিল্লাইয়া কমু। তর জন্যে আইজ আমার এই শাস্তি। তুই, তুই মারছস তর বাপেরে।

তাঁর চাপা চিৎকারে শিউরে উঠলো অন্ধকার। এক অজানা ভয়ে কেঁপে উঠল আমার আত্মা। কালো একজোড়া হাত যেন এগিয়ে আসছে আমার দিকে। শুকনো গলায় ঢোক গেলার ব্যর্থ চেষ্টা করে জিগ্যেস করলাম, আমি, আমি মেরেছি মানে?

সে মানুষটা সাঁতার জানতো না। আজরাইল হইয়া আইছিলি তুই মনে নাই? গাঙের পাড়ে খাড়াইয়া আছিল, ধাক্কা দিয়া তারে ফালাইলি। ভরা বর্ষার ঢল থিকা আর সে উইঠল না। আমার কপাল ভাইঙা এখন আমারেই শাসাস? কমুই তো, তর সাথে আমার কিসের সম্পর্ক? আমি চিল্লাইয়া কমু।

একটা দীর্ঘ তীক্ষ্ণ তরবারি দিয়ে কে যেন আমার হৃদপিণ্ডটা উপড়ে নিয়ে চলে গেল। আমি আর্তনাদ করে উঠলাম।

৪. চশমার কাঁচ আচ্ছন্ন হয়ে গেল

আমার চশমার কাঁচ আচ্ছন্ন হয়ে গেল গরম কফির ধোঁয়ায়–ঠিক যে মুহূর্তে চুমুক দেবার জন্য মুখ নামিয়েছি, তখন।

এই জিনিসটা আমার খুব ভালো লাগত; এই বাষ্প লেগে দৃষ্টি শাদা হয়ে যাওয়া, বিন্দু বিন্দু জলকণার মধ্যে অণুর মতো রামধনুর রং দেখতে পাওয়া। আর সুগন্ধ, কালোকফির সাড়া জাগানো সুবাস। অন্যান্য দিন, এই রকম একা বসতাম আমি, কোনো রেস্তোরাঁয়, কালো কফির পেয়ালা নিয়ে, বিকেলে, ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে এয়ার কণ্ডিশনার থেকে, লোকেরা চলত মৃদু পায়ে, সুন্দরী মেয়েদের দেখা পাওয়া যেত। ভুলে যাওয়া এক উপন্যাসে পড়া নায়কের মতো আমি কালোকফি চুমুকে চুমুকে নিঃশেষ করতাম, যেন এমনি করেই সে নায়ক কাছে। পাচ্ছে তার মেয়েটিকে যে মেয়েটি ভালোবাসত কালোকফি। আমার অনেকদিন ইচ্ছে হয়েছে, নিশাতকে ঐ উপন্যাসের মেয়েটির মতো কালোকফির জন্যে পাগল হতে দেখি। কিন্তু আমার স্কুটারে চড়ার আনন্দও যেমন অর্থহীন কিংবা দুর্বোধ্য নিশাতের কাছে, তেমনি কালোকফির স্বাদটা। নিশাত কালোকফি একেবারেই খেতে পারে না। সরু করে ফেলে ঠোঁট বলে, হেমলক। বিষ।

আমি তখন হো হো করে হেসে বলি, আর আমি সক্রেটিস?

আহা। তার পায়ের কড়ে আঙুল। বলতে বলতে নিশাত ঢেলে নেয় দুধ। কালোকফির স্বচ্ছ মেহগনি রংটা ঘুরতে ঘুরতে বাদামি হয়ে যায়। আমার মনে হয়, আমার একটা আনন্দ ঐ পেয়ালার মধ্যে চামচের আবর্তনে বিষাদের চেহারা নিল।

ঢাকায় ফিরেছি সকালবেলা। স্টেশন থেকেই টেলিফোন করে দিয়েছি নিশাতের কলেজে। সন্ধ্যে সাতটায় দেখা হবে, মোহাম্মদপুর স্কুলের বোর্ডিং গেটে দাঁড়িয়ে থাকব আমি। এবং আজকেই ঠিক করে ফেলব বিয়ের প্রস্তাব করে কীভাবে পাঠানো যায়।

সিনেমার ব্যানারে বড় বড় মুখ। আমি অবাক হয়ে দেখছি। হাত ঘড়িতে স'পাঁচটা বাজে। হাসি পেল। বড় অধৈর্য হয়ে উঠেছি আমি: নিশাতের সঙ্গে অনেক কটা দিন এবং অনেকগুলো মাইল ভ্রমণের পর আজ আবার দেখা হবে, তাই আমার ভেতরটা লাগছে নতুন প্রেমে পড়া ছোঁকরার মতো–মাতাল, উদ্বেগে অস্থির; গলার কাছে নামহীন বাষ্পের পিণ্ড আর রক্তিম কর্ণমূল আমার।

বসলাম সেই রেস্তোরাঁটায় যেখানে নিশাতের সঙ্গে সে রাতে বসেছিলাম। নিশাত বলছিল, বাড়িতে মেহমান আসবে; আর আমি বলছিলাম, খানিকটা অভিমান করেই, বেশ তুমি খাবে তো খাবে না, আমি খাই, বসে বসে দেখো। নিশাত অবশেষে খেতে রাজি হয়েছিল। একজন বেয়ারা প্যাড পেন্সিল হাতে করে লিখে নিচ্ছিল আমাদের পছন্দ। গরম সুপের স্পর্শে নিশাত তার ঠোঁট কুঁচকে ফেলেছিল।

কফির জন্যে বললাম আমি। কফি এলো। চুমুক দিতে যাবে, তখন তার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল আমার চশমার কাঁচ। আর সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতরটায় কী হয়ে গেল কিছু ঠাহর করতে পারলাম না, বিশ্ব-সংসারের চেহারাই যেন পালটে গেল এক নিমেষে। লুপ্ত হয়ে গেল চারদিকের ছবি, দেয়াল, মানুষ, কাউন্টার, আমার কফির পেয়ালা। চোখ তুলে দেখি, ভালো করে কিছুই দেখতে পারছি না আমি। ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে আমার কাঁচ, না, পৃথিবী আমার সমুখ থেকে বিদায় নিচ্ছে? হঠাৎ প্রচণ্ড কান্না হতে লাগল ভেতরে। নিজেকে নিঃসঙ্গ, বধির, পরিত্যক্ত মনে হলো। ভুলে গেলাম চশমার কাঁচ পরিষ্কার করলেই সব আবার দেখতে পাবো আমি। যেন পৃথিবী আমাকে চরমভাবে বঞ্চিত করে চারদিক থেকে হা-হা করে হাসছে আর আমি ডুবে যাচ্ছি।

কোথায় আমার আনন্দ? আমার কালোকফির প্রিয় স্বাদ? বাষ্পের মধুর স্পর্শ? আমি হত্যাকারী। বাবাকে আমি হত্যা করেছি। চোখের সামনে খাটো কালো কোট পরা বেয়ারাকে মনে হচ্ছে ব্যারিস্টার, আমার দিকে তর্জনী তুলে, দূরে কাউন্টারে, যেন বিচারকের উচ্চাসনে আসীন বিচারপতি ঐ নির্বিকার-মুখ ম্যানেজার, তাকে বলছে, এর চেয়ে ঘৃণ্যতম অপরাধ আর কী হতে পারে। পুত্র হত্যা করেছে পিতাকে। পিতা, যে পিতা মুখের অন্ন আর বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ করেছে সন্তানকে।

এই পৃথিবীটাকে আমার মনে হয় এক অর্থহীন অদ্ভুত চক্রান্ত, যার ভেতর থেকে আমরা আমাদের নিজস্ব অর্থ বার করে নিই-এবং যার একাংশও বোধগম্য নয় আরেকজনের কাছে। কাল রাতে বাজ পড়ল, আজ আমার ছেলেটা মারা গেল-অতএব বাজ পড়াটা ছিল মৃত্যুর অগ্রদূত, এমনি করেই তো দুই বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যে ঐক্য খুঁজেছি, অর্থের

সঞ্চার করেছি আমরা। সঞ্চার বলাও ভুল, বলতে পারি –জন্ম, জন্ম দিয়েছি অর্থের। মানুষ বোধহয় অর্থহীন, সম্পর্কহীন কোনকিছুকেই ধারণা করতে পারে না। সম্ভবত তার রক্তের মধ্যে রয়েছে এক অসীম–শূন্যতার আতঙ্ক, যার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে মানুষ প্রতি মুহূর্তে সৃষ্টি করছে স্বপ্ন আর বিভ্রম।

আমি কি ব্যতিক্রম?

কী জানি। কিন্তু আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, আমার সমুখে কালোকফি, তার ধোঁয়ায় চশমার কাঁচ হঠাৎ কুয়াশা হয়ে যাওয়া, এর সঙ্গে আমার বাবার মৃত্যুর ইতিহাস মনে পড়ে যাবার কোনো সম্পর্ক নেই। তবু মনে পড়েছে। এবং এত কঠিনভাবে মনে পড়েছে যে আমার পুরনো পৃথিবী ধ্বসে ধ্বসে পড়ছে তার নির্মম আঘাতে, ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আসছে। আমি তাকিয়ে আছি পেয়ালায় রাখা কালোকফির দিকে। আস্তে আস্তে বাতাসে কেটে যাচ্ছে কাঁচ থেকে বাষ্পের কণাগুলো। স্বচ্ছ হয়ে আসছে। আবার আমি দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি মৃদু রেখায় তখনো ধোঁয়া উঠছে পেয়ালা থেকে।

এ সবই কয়েকটি সেকেণ্ডের মধ্যে ঘটে গেছে। কিন্তু আমি সেই পুরনো আমি আর নেই। আজ যখন পেছনের দিকে তাকিয়ে এই ঘটনাটা মনে করবার চেষ্টা করছি, আবার যখন মুহূর্তগুলোকে তাদের সম্পূর্ণ বিবরণের জন্যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি, তখন এক হতাশায় ভরে আসছে আমার মন, ক্লান্ত হচ্ছে আমার কলম। কারণ, কিছুই সঠিক অনুক্রমে মনে পড়ছে না, অনেক জরুরি জিনিশ, মনে হচ্ছে, ভুলে গেছি এবং দেখছি অনেক তুচ্ছাতিতুচ্ছ স্মৃতির আলোয় জ্বলজ্বল করছে। ঠিক কোন্ জিনিস কোন্ ভাবনা কিংবা

কার মুখ অথবা কোন মুহূর্ত, আমাকে মনে করিয়ে দিল বাবার মৃত্যুর ইতিহাস সেদিন সেই রেস্তোরাঁয় তা আজ আর কিছুতেই বলা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, যদিও বা কোনো কারণ বের করতে পারি, তা হবে কাল্পনিক, আমার নিজের সৃষ্টি করা। আমি কেবল এইটুকু বলতে পারি, কালোকফির ধোঁয়ায় যখন আচ্ছন্ন হয়ে গেল আমার চশমার কাঁচ তখন সেই চরম বিপ্লব ঘটে গেল আমার চিন্তার ভেতরে।

অথচ সেদিন রাতে গ্রামের সেই রুদ্ধশ্বাস অন্ধকার ঘরে, মা যখন আমার বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বিষের মতো কথাগুলো উচ্চারণ করলেন তখন এতটা লাগেনি। তখন কেবল একটা যন্ত্রণা হয়েছিল, যার পরিণতি হয় না। আমি যখন চলে এলাম–পরদিন সকালে আসতে পারিনি, ফিরোজা আমাকে আরো একদিন জোর করে রেখে দিয়েছিল–তখনো এত সহস্র হয়ে বাজেনি ঐ মৃত্যুর ইতিহাস। বরং আমার মনটা বেশ ভালোই ছিল পরদিন। ফিরোজা এসে বলল, চা পাইতে দেরি হইব। আমরা কেউ চা খাই না। বাজারে মানুষ পাঠাইছি।

আমার তখন মনে হলো, অকারণে, কিন্তু একটা বেদনার মতো, ফিরোজার স্বামী বোধহয় চা খেতেন রোজ সকালে। বললাম, রিয়াজ কই?

কে জানে?

পাঠিয়ে দিন না? বেশ হয়েছে দেখতে। পড়তে দেননি?

অর আবার পড়া। ফিরোজা ম্লান হেসে বলল, পইড়া যা করবো আমার জানা আছে। হালের। মুঠি না ধরলে ভাত জুটবো না। ঐ বই নিয়া মনে কইলে যায় ইস্কুলে।

অবাক হলাম ফিরোজার কথা শুনে। লেখাপড়ার দিকে এত বিতৃষ্ণা, আমি, হতে পারে জানতাম না। ছেলে হবে, এবং বয়স হলে স্কুলে যাবে, পাশ করবে, এইটেই আমার কাছে। স্বাভাবিক। হাল না ধরলে ভাত জুটবে না–এর মতো অসম্ভব যেন আমি আর কিছু শুনিনি। ব্যাকুল হয়ে বললাম, ছি ছি, এটা কী হলো? লেখাপড়া না শিখলে কেউ বড় হয়? টাউনে কেউ নেই?–মানে ওর বাবার মানে, শহরে থাকলে ওর লেখাপড়ার মন হতো। ভালো হতো।

ফিরোজা বলল, অর চাচারা নিতে চাইছিল। আমি দেই নাই। কী খাইবো, কী পরবো, চাচিরা নিজের থুইয়া পরের ছাওয়াল আপনা করবো কেন? পর আপনা হয় না, ভাই। একবারে এতিম হইয়া যাইতো রিয়াজ, নিয়া আসছি, আল্লা দিলে এমনি চলবো।

চোখে পানি এসে গিয়েছিল আমার। গতরাতে ভাবছিলাম, বললে রিয়াজকে সঙ্গে নিয়ে যেতাম। সে কথাটাও বলতে পারলাম না। বললাম, ভারী সুন্দর হয়েছে ছেলেটা। ফিরোজা তখন চলে গেল।

বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে চনমন করে খিদেটা উঠল আমার। খেলাম প্রচুর। রিয়াজ আমার কোলের কাছে বসে পা ছড়িয়ে ভাত–তরকারি ঢেলে বাঘা বাঘা হাতে খেল। মা এসেছিলেন পরবেশন করতে। খোরশেদ সাহেব একটা মামলার তদবিরে ফজরের

আগেই চলে গেছেন শহরে, ফিরবেন রাত্তিরে। তার সঙ্গে আমার সকালে দেখা হয়নি। যাবার কথা বলতেই মা মৃদুস্বরে আপত্তি করলেন এবং কারণ দেখালেন, ফিরোজার বাপ বাড়ি নাই। তুমি যাইবা, সে কী কইবো?

গত রাতের কিছুই যে আমার মনে নেই, এবং মনে থাকলেও তা দুঃস্বপ্ন বলেই ধরে নিয়েছি। এ বিষয়ে আমি এখন নিশ্চিত। কারণ, ঐ কথাগুলো মনে থাকলে আমি তখন হাসতে পারতাম না।

হাসছিলাম। মা আমাকে চোখ তুলে কৌতূহল ভরে একবার দেখলেন, দেখে চোখ নামিয়ে নিলেন আমার চোখ পড়াতে। দুজনেই বুঝতে পারলাম, অথচ কেউই বললাম না, তিনি আমাকে যেতে দিতে চান না, খোরশেদ সাহেব থাকলেও আজ সকালে আমার যাওয়া হতো

। আমি যে বুঝতে পেরেছি এটা টের পেয়ে মার মুখ রাঙা হয়ে উঠল। এবং আমার তখন সেই মুহূর্তে সেই এক দুপুরের রৌদ্র ঝরা বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে তুলতে চিরদিনের চেনা মনে হলো মা-কে।

সেই রাঙা হাসিটা মনে আছে আমার যে কোনো এইমাত্র দেখা ছবির মতো। আরো বিশেষ করে মনে আছে এই কারণে যে, অমৃতের মতো মধুর মনে হয়েছিল যে মুখ, সেই মুখ কল্পনার চোখে যদিও, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আজ কিন্তু অনুভূতির লেশমাত্র আর নেই। কী করে এই বিচ্যুতি ঘটলো, স্মৃতির ছবি থেকে কখন অপসারিত হলো অর্থের

ইন্দ্রজাল, তা বিশ্লেষণ করলে দুটো পাঁচটা রাত কেটে যাবে, কোনো তথ্য দিতে পারব না।

আমার সেদিন আর যাওয়া হলো না। তার পরদিনও না। পরদিন দুপুরবেলায় মা আমাকে তার প্রথম বিয়ের লাল চেলিটা ভাঁজ করে বুকের কাছে লুকিয়ে এনে দিলেন। আমি খুব অবাক হলাম। সকালে মাকে বলেছিলাম, নিশাতের কথা। বলছিলাম, আমার বিয়েতে তার আসা চাই। তিনি মুখে কিছু বললেন না, নামিয়ে নিলেন মুখ, তার কোলের পরে ঘুমিয়ে পড়ল সব ছোট মেয়েটা আমি বুঝতে পারলাম, আসলে আমার মা-কে ডাকাই উচিত হয়নি। আমার বয়স হয়েছে, এবং আমার বোঝা উচিত ছিল, মার পক্ষে কিছুতেই এখন আর সম্ভব নয় এই বাড়ির বাইরে এসে তার প্রথম পক্ষের ছেলে, আমি, আমার সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক স্থাপন করা। অত্যন্ত লজ্জিত হলাম। মার জন্যে আমার প্রবল কষ্ট হলো। সেটাকে কবর দেবার জন্যে জোর করে হেসে বললাম, বিয়ের পরে নিয়ে আসব নিশাতকে।

আমার দিকে বোবা চোখে তাকালেন তিনি। তখন সে চাহনিটার কোনো অর্থ স্পষ্ট হয়নি আমার কাছে, কিংবা অবান্তর একটি অভিব্যক্তি বলে মনে হয়েছে ওটা, যা আমরা অহরহ প্রশ্রয় দিয়ে থাকি যে কোনো দুজন বা তারো বেশি একসঙ্গে বসলে। আমার ফিরতি ট্রেনটা যখন আমাকে নিয়ে যাচ্ছিল ঢাকার দিকে, তখন বিচ্ছিন্ন অনেকগুলো ছবির ভেতরে মার এই বোবা চাহনিটা মনে পড়েছিল। কিন্তু তখনো বুঝতে পারিনি কী তিনি বলতে চেয়েছিলেন সে দৃষ্টি তুলে। আজো তার সন্ধান পাইনি। অথচ, আমার স্মৃতি যখন এত উজ্জ্বল করে ধরে রেখেছে সেই চাহনিটা, তখন নিশ্চয়ই তার কোনো মানে আছে,

আমার মনে এত গভীর দাগ কেটে গেল যে মুহূর্ত, তার অর্থ আমি না জানলেও কোথাও না কোথাও লেখা আছে।

লাল চেলিটা হাতে নেবার পরও ভালো করে বুঝতে পারিনি আমি একটা বিয়ের শাড়ি হাতে করে আছি, এবং এই শাড়ি পরে আমার বাবাকে প্রথম দেখেছিলেন মা আজ থেকে তিরিশ বছর আগের এক রাতে। শিরশির করে উঠলো আমার গা। নিঃশ্বাস ভারী করে তুললো দীর্ঘদিন ট্রাঙ্কে বন্দি হয়ে থাকার মোহনীয় ঘ্রাণ। বোকার মতো জিগ্যেস করলাম, কার? কার আবার? আমার বিয়া হইছিল এই শাড়ি পইরা।

বলে না দিলেও বুঝতে পারলাম বিয়ে মানে আমার বাবার সঙ্গে বিয়ে। বুঝতে পারলাম দীর্ঘ বৎসরগুলো মা এই শাড়ির সঙ্গে তার প্রথম পুরুষ, ভালোবাসা, ভয়, মৃত্যু ও অশ্রুকে একত্রিত করে সমস্ত আলো ও বাস্তব থেকে দূরে তোরঙ্গের তলায় নিরন্ধ্র গহ্বরে চাপা দিয়ে রেখেছিলেন। জানতে পারেনি বিশ্ব, হয়ত তিনি নিজেও ভুলে গেছেন একদিন আস্তে আস্তে; আমি সেই মৃতকে জীবন্ত করে তুললাম।

বললাম, কী করব?

বউরে দিও।

আমার এখনো মনে আছে সেই শাড়িটা নিয়ে আমি অনেকক্ষণ বসেছিলাম অবাক হয়ে। বৃষ্টির মতো নরোম গুঞ্জনে, কিসের কে জানে, আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল আমার মন। মার

দিকে দেখছিলাম। এবং আমার কিছুতেই যেন খুশির কুলান হচ্ছিল না হৃদয়ে। রিয়াজ এসে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল, টানাটানি করতে লাগল শাড়িটা নিয়ে। মা তাকে ছাড়িয়ে নিতে নিতে বললেন, সর, সর, ডাকাইত।

এক সময় ফিরোজা বলল, বউ নিয়া আসবেন কইলাম।

আচ্ছা, আসব।

এখন আমার ভালো করে মনেও নেই সেদিন কোন ঘটনা কোনটার পরে ঘটেছিল। মার শাড়ি দেয়া, ফিরোজার অনুবোধ, রিয়াজের এসে দাঁড়ানো–এসব কোন অনুক্রমে ঘটেছিল? কেবল এটুকু মনে আছে আমার মনটা খুব ভালো ছিল, আমি বেশ সহজ হয়ে উঠেছিলাম, পরদিন আসবার সময় খুব খারাপ লেগেছিল আমার, ফিরোজা আর মা বাড়ির শেষ সীমানা পর্যন্ত এসে পুকুরের ওপারে সুপুরি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে যতদূর দেখা যায় তাকিয়েছিলেন। আমি ধরা গলায় বলেছিলাম, আবার আসব, বউ নিয়ে।

আগাগোড়া ঘটনাগুলোর মধ্যে কোথায় যেন একটা ফাঁকি ছিল যেটা আমি তখন বুঝতে পরিনি। আমি সহজেই ভুলে যেতে পেরেছিলাম প্রথম রাতে দুঃস্বপ্নের মতো মার আবির্ভাব আর বিয়ের মতো মৃত্যুময় কিন্তু সত্য, আমার বাবার সেই মৃত্যুর ইতিহাস এবং সহজেই পেরেছিলাম এই সংসাব, যে সংসার আমার নয়, যে সংসারে আমি চিরদিনের অবাঞ্ছিত, সেই সংসারকে আপন করে দেখতে; এমন কি ফিরোজাকে আমার ভাল লাগতে চেয়েছিল, রিয়াজকে আমি শহরে নিয়ে যাবার কথাও চিন্তা করেছি।

ফাঁকি ছিল নিশ্চয়ই, আমি আমার অজান্তে অভিনয় করেছিলাম। এছাড়া আর কী ব্যাখ্যা থাকতে পারে অমন ব্যবহারে। বাবার মৃত্যু ইতিহাস শোনবার পর নিজের দুঃসহ গ্লানি ঢাকবার হয়ত ব্যর্থ চেষ্টা ছিল ওগুলো। নইলে ওখানে দুদিন, তারপর সারাদিন সারারাত ট্রেনে ঢাকায় ফেরা, ঢাকায় ফিরে এই বিকেল অবধি কম করে হলেও মোট নব্বই ঘণ্টাব মধ্যে একবারও কেন মনে পড়ল না রাতে মায়ের মুখে শোনা কথাগুলো? আমার হাতে বাবার মৃত্যু হয়েছে, এই অপ্রত্যাশিত খবরটা নিয়ে কোনো আলোড়নের স্মৃতিই আমার মনে নেই।

কফির ধোঁয়ায় চশমার কাঁচ যখন কুয়াশা হয়ে গেল, তখন কোন ইন্দ্রজালে অবচেতনের রুদ্ধ দুয়ার খুলে গেল। ছড়িয়ে ছিটকে পড়ল আমার গ্লানি, আমার পাপ, আমার ক্ষমাহীন অস্তিত্ব। আমার কাছে লুপ্ত হলো আশা বাস্তব এবং বর্তমান; দুলে উঠল অতীতের ভারী পর্দা যা ঢেকে রেখেছিল আমার স্মৃতিকে।

পেয়ালার দিকে তাকিয়ে একে একে মনে পড়তে লাগল পেছনের দিনগুলো। আমাকে কোন আয়াসই স্বীকার করতে হচ্ছে না, তারা আপনা থেকেই আসছে এবং দেখিয়ে যাচ্ছে নিজেদের গঠনগুলো। ছাব্বিশ বছর যে স্মৃতির কোনো চিহ্নমাত্র ছিল না, ঈশ্বর তা বিস্মৃতির ধূলি থেকে আবার নবদেহে হাজির করতে লাগলেন। দেখলাম, আমি শিশু হয়ে গেছি। দেখলাম, বাবার হাত ধরে আমি দাঁড়িয়ে আছি বাড়ির সামনে ঘাসের ওপর, বেলা পড়ে যাচ্ছে। আবার দেখলাম, ও পাড়ার এক গরিব বউ এসে মার কাছে চাল চাইছে– আমাকে দেখে হাসছে আর বলছে, গ্যাদা কত বড় হইছে গো। শুনলাম, এই আমার দাই

মা। দাই মা আবার কেমন মা? স্পষ্ট দেখতে পেলাম আমি সারাদিন একা একা হাঁটছি আর এ কথাটা ভাবছি।

কোথায় ছিল স্মৃতিগুলো এই ছাব্বিশটি বছর? মার একটা কথার শেষ যেন উড়িয়ে দিয়েছে শোয়ার দরোজা, পতন হয়েছে বিস্মৃতির নগরের, ঐ দেখা অচ্ছে। দেখলাম, নদীতে প্রবল স্রোত নেমেছে, ঘোলা পানি খল খল করে তালি বাজাতে বাজাতে ঘুরতে ঘুরতে বয়ে চলেছে; তার মুখে গাছপালা বাড়িঘর কিছু আটকাচ্ছে না, পাড় থেকে বড় বড় চাঙ্গড় ধ্বসে পড়ছে। দিনরাত। ভোর রাতে আমাকে ঘুম থেকে তুলে বাবা বললেন, গ্যাদা চলো, নদী দেইখা আসি। ভাঙতেছে।

আমি ভোরের অস্পষ্ট আলোর ভেতরে চলছি চোখ ডলতে ডলতে। ক্রমে রাঙা হয়ে উঠছে। সূর্য, আস্তে আস্তে বাড়িঘর গাছপালার ছবি স্পষ্ট হয়ে আসছে, দূর থেকে বেতালা ঢাকের মতো আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি আর নাকে এসে সুড়সুড়ি দিচ্ছে ভোরের ফুরফুরে হাওয়া।

বাবা বললেন, শুনছাও? নদী ভাঙ্গে তার আওয়াজ। য্যান ঢাক বাজে না?

তখন আমার খুব ফুর্তি হলো। বাবা হাত ছেড়ে দিয়ে লাফাতে লাফাতে তার আগে আগেই চললাম। তিনি পেছনে থেকে মুখে যদিও বললেন, দেইখ্যা, পইড়া যাইবা, কিন্তু বাধা দিলেন না আমাকে।

একেবারে সেদিনকার কথার মতো আমার মনে পড়ছে এই লাফিয়ে চলার দৃশ্যটা। মনে করতে করতে চোখে পানি এসে গেছে আমার, খেয়াল করিনি। কফিতে একটা চুমুক দিয়ে নড়ে-চড়ে বসলাম তখন। সিগারেট ধরালাম। ধরিয়ে দেখি, স্মৃতির সূত্রটা ছিঁড়ে গেছে। ধারাবাহিকভাবে কিছুতেই আর মনে পড়ছে না কিছু। যেন ঐ লাফিয়ে চলাটা অনন্তকাল পর্যন্ত চলেছিল।

তারপর যে ছবিটা মনে পড়ল—-দেখতে পাচ্ছি, বাবা নদীর উঁচু পাড়ের একেবারে কিনারায় দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে কী দেখছেন। আমি তার পেছনটা দেখতে পাচ্ছি অনেক দূর থেকে। খুব মজা লাগছে আমার বাবাকে অমন ঝুঁকে পড়ে থাকতে দেখে। দৌড়ে এসে হাসতে হাসতে তাঁর পিঠে দিলাম ধাক্কা; এখনি তিনি যেন সচকিত হয়ে উঠবেন এবং দেখে হেসে ফেলে তাড়া করবেন ধরবার জন্যে, যেমন আমার খেলার বন্ধুরা করে থাকে। কিন্তু বাবা সে সব কিছুই করলেন না। বিরাট একটা গাছের গুঁড়ির মতো গড়িয়ে পড়লেন নদীর ভেতরে। ছলাৎ করে একটা শব্দ উঠল। আমার চোখের সামনে হাত খানেক মাটিতে সরু কালো সূতোর মতো চিড় ধরলো। চিৎকার করে পেছনে ছুটে আসতেই দেখলাম একটা বড় চাঁদের আকারে খানিকটা পাড় ধ্বসে পড়ল নদীতে যেখানে একমুহূর্ত আগে ছিলাম আমি এবং আমার একমুহূর্ত আগে বাবা।

আর মনে নেই। তারপর যে স্মৃতিটা একেবারে পিঠেপিঠে মনে পড়ে তা হচ্ছে আমার চাচি ডিমের মতো গোল দলা পাকিয়ে ভাত খাইয়ে দিচ্ছেন আমাকে আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে। এই একটা ছবি বাবার গড়িয়ে পড়া, আমার লাফিয়ে পেছনে হটে আসা, বারবার ফিরে ফিরে মনে পড়তে লাগল রেস্তোরাঁয় বসে। যেন এমনি করে দেখে দেখে আমি

আরো কিছু নতুন তথ্য আবিষ্কার করতে পারবো। আমি তো হত্যাকারী, বাবাকে হত্যা করেছি, নতুন কোনো তথ্য যেন সে সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে আরো; আমাকে নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন করবে। জগতের ঘৃণ্যতম অপরাধী হিসেবে।

পেয়ালার কফি ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আরো এক পট আনতে বললাম বেয়ারাকে। একটু আগে যাকে আমার মনে হয়েছিল আদালতের ব্যারিস্টার, অভিযুক্ত করছে আমাকে, চরম শাস্তি প্রার্থনা করছে আমার জন্যে, সে আরেক পট কফি এনে রাখলো।

আজ আমি আর ওকালতি করি না, কাজি সাহেবের জুনিয়রি ছেড়ে দিয়েছি যেন কত যুগ আগে, তাই আজো আমার স্পষ্ট করে মনে পড়ে ওয়েটারের কালো কোটকে ব্যারিস্টারের কালো কোট বলে ভুল করার করুণ সম্ভব মুহূর্তটি।

আমার তখন ঝোঁক চেপে গিয়েছিল নিজেকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দেয়ার। যে কয়েক হাজার টাকা ব্যাঙ্কে ছিল, তা আমার শেষ নির্ভর, আমার অনেক স্বপ্নের ভিত্তি। প্রথমেই সে টাকাগুলো উড়িয়ে ছত্রখান করে দেবার তীব্র বাসনা হলো। একদিন পাঁচশ টাকা তুললাম। কিন্তু কী করা যায় পাঁচশ টাকা দিয়ে এই ঢাকা শহরে? একটা দোকানে উঠে সেন্ট কিনলাম এক গাদা, শাড়ি কিনলাম, মেয়েদের চপ্পল পছন্দ হলো দুজোড়া–তাও নিলাম। আর নিজের জন্যে, যা কোনদিন পারব কল্পনা করিনি, কিনলাম দামি টোব্যাকো, পাইপ, ড্রেসিং গাউন আর একটা সোনার ক্যাপ কলম। এক সন্ধ্যায় ফতুর পাঁচশ টাকা। আজ সে সব কথা মনে পড়ে হাসি পায়। সিনেমা দেখার অভ্যেসটা ছিল আমার মোলআনা; মনে হয়, বাংলা কোনো ছবিতে কাউকে দেখে থাকব গাউন পরে পাইপ

খেতে, কথা বলতে অত্যন্ত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে –তাই নিজের জন্যে ওগুলো কিনেছিলাম। আসলে নিজেকে শক্ত সবল করে দাঁড় করানোর হাস্যকর প্রয়াস হিসেবেই এই কেনার অভিযান, যা তখন বুঝতে পারিনি। এখনো হয়ত সুটকেশের তলায় পড়ে আছে গাউনটা, প্রথম কয়েকদিন ব্যবহারের পর সেই যে ফেলে রেখেছি আর ফিরে তাকানোও হয়নি।

ফিরে তাকাবো কী, আমার মনে তখন শূন্য মাঠে তপ্ত বাতাসের ঘূর্ণি হচ্ছে। আমার তখন একটাই কথা, আমি যখন আমার বাবাকেই এই দুহাতে ধাক্কা দিয়ে হত্যা করতে পেরেছি, তখন পৃথিবীতে আমার কিসের ভয়, কিসের তোয়াক্কা। আমি যেন যা খুশি তা করতে পারি। যে ছেলে পরীক্ষায় ফেল করেছে তার অঙ্কে দশ পেলেই কী আর আশি পেলেই বা কী? আমার যেন সমস্ত নীতি, শৃঙ্খলাবোধ, সব তছনছ হয়ে গেছে; উচ্চাশা হাস্যকর, সংসার অসম্ভবের আহ্বান, কর্ম এবং অর্থ অর্থহীন। যে শাস্তি আইন আমাকে দিতে পারেনি, তার চেয়ে বড় শাস্তি সৃষ্টির সাধনা তখন আমি করছিলাম সমস্ত স্বপ্ন গুঁড়িয়ে দিয়ে, সাধ উপেক্ষা করে, আত্মনিপীড়ন আর বঞ্চনার ভেতর দিয়ে।

সেন্ট, শাড়ি, চপ্পল কিনেছিলাম কার কথা মনে করে এখন আর মনে নেই। নিশাতের কথা ভেবে থাকব? কিন্তু নিশাত তখন আমার চেনাজগৎ থেকে এত দূরে যে তাকে মনে হতো মৃত একটি মানুষ, যার নাম আমার মনে আছে, মুখ; কিন্তু যার কাছে আর যাওয়া যায় না। রুমি? সম্ভবত তাও নয়। কারণ, রুমি হলে আমি বেছে বেছে গাঢ় রংয়ের শাড়িগুলো কিনতাম না। রুমি ছিল কালো; আমার বেশ মনে আছে, রুমি একেকদিন সবুজ বা ঐ রকম গাঢ় রংয়ের শাড়ি পরতো বলে আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠতো। আমি যা কিনেছিলাম তা একজন ফর্সা রক্তিম মেয়েকেই মানাতো বেশ। ফিরোজার জন্যেও

কিনিনি। কারণ, সেদিন রেস্তোরাঁয় কালোকফির ধোঁয়ায় চশমার কাঁচ ঢেকে আসবার মুহূর্তেই আমার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে মোরশেদ সাহেবের পরিবারের সঙ্গে।

আজ আমার মনে হয়, নিশাতকে ভুলেও আমি ভুলতে পারিনি সেদিন–যেমন আজো পারিনি, এই লেখার মুহূর্ত পর্যন্ত পারছি না। নিশাতের কথা ভেবেই হয়ত কিনেছিলাম ওগুলো। যে দেয়াল আমি নিজেই তুলেছি, তা ভেঙ্গে আবার নিশাতের কাছে ফিরে যেতে পারবো না; কারণ, আমার আত্মাভিমান বড় প্রবল তখন। যা কিছু ছিল আমি যে আমিই, এবং আমার সব সঠিক– এই অহঙ্কারটা ছিল ষোলআনা। কিন্তু মনের একেবারে শেষ কোণায় বোধহয় আকাঙ্ক্ষাটা মরেও মরেনি; এই আশেপাশেটা যায়নি, যে ইচ্ছে করলেই নিশাতকে আমি বউ করতে পারতাম। তাই ওই সেন্ট, শাড়ি, চপ্পল কেনার ভেতর দিয়ে হয়ত অসম্ভব আশা করেছি, নিশাতকে আমি নিজেই সৃষ্টি করে নিতে পারবো। জিনিসগুলোর মধ্যে তার রক্তিম উষ্ণ শরীরটা যেন স্পন্দনমান হয়ে উঠবে। এটাকে আমার এখন মনে হয় মস্তিষ্ক বিকৃতির এক ধরনের লক্ষণ। কিন্তু তখন সেটা বুঝতে পারিনি কারণ, তখন আমি যা করছিলাম তা–ই মনে হচ্ছিল এবং যে কোনো যুক্তি ও সত্যের বিরোধিতা করবার জেদ ছিল প্রচুর।

বাড়ি বয়ে নিয়ে এসে, মনে আছে, প্রথমেই হাঁক পেড়ে ডাকলাম জালালের স্ত্রীকে। তিনি ছেলেটাকে পড়াচ্ছিলেন মেঝেয় শুয়ে শুয়ে। আমার আওয়াজ শুনে ধরমর করে উঠে এলেন। গায়ে গতরে শাড়ি টানতে টানতে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমি বলি, কে না কে? এগুলো কী?

দেখুন না কী? বলতে বলতে তার হাতে তুলে দিলাম সেন্ট, শাড়ি, চপ্পলের ব্রাউন কাগজ মোড়া প্যাকেটগুলো। জালাল আমার দিকে চকচকে চোখে তাকাল, যেন মহা দুর্বোধ্য কিছু তার চোখের সামনে ম্যাজিকের মতো ঘটে যাচ্ছে।

আমার এখন হাসি পায়, আমি ওকালতি করতাম, মানুষের মনস্তত্ত্ব নিয়ে আমাকে কারবার করতে হতো, অথচ সেদিন যা করলাম তা নেহাৎ মূখের কী নির্বোধের মতো একটা কাণ্ড; পূর্বাপর ভাবলাম না একটুও, জালালের স্ত্রীকে সেই শাড়ি চপ্পল দিয়ে বসলাম। তার সঙ্গে আমার ঠাট্টা চলত, জালাল আমার ভালো বন্ধু। তারো চেয়ে সত্য, মানুষের মন এক জটিল যন্ত্র যার কোন্ কাটার আবর্তনে কোন্ কাঁটা ঘুরবে তা অঙ্ক-ফলের মতো বলা যায় না।

জিনিসগুলো খুলতে খুলতে জালালের স্ত্রীর মুখে গভীরতর হতে লাগল আনন্দ–উল্লাসের রেখাগুলো, ছোট্ট একটা মেয়ের মতো খুশি দেখাতে থাকল সে। আমি সেদিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলাম।

নিশাতের সঙ্গে আমার বিয়ে হচ্ছে না, একথাটা ওদের জানানো হয়েছিল কিনা মনে নেই। খুব সম্ভব বলেছিলাম। এবং এটা আরো সম্ভব, মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে নিশাতের সঙ্গে আমার সম্পর্কের এত বিরাট পরিবর্তন কী করে ঘটল তা জানবার জন্যে ওরা স্বামী স্ত্রীতে ভীষণ পীড়াপীড়ি করেছিল আমাকে। সম্ভবত এইজন্যে বলছি, আমার উপহার তাহলে জালালের মুখ কালো করে দিত না। জালাল ভেবেছিল, আসলে আমি একা উড়নচণ্ডি লক্কা পায়রা– এইমাত্র একটি মেয়েকে কথা দিয়ে আর বিয়ে করলাম না

এবং পরদিন বিনি মাশুলে গাড়ি চড়ার আনন্দ খুঁজতে বেরুলাম কৌশলে বন্ধু-স্ত্রীর প্রতি নিজের অনুরাগ জানিয়ে। আমি জালালকে দোষ দিই না। নিশাতের মতো সাফ মাথা, অনুভূতি-সম্পন্ন মেয়েই যদি ভুল বুঝতে পারে তো জালাল কোন ছার। জালাল আমার বন্ধু কেবল, আর নিশাতের সঙ্গে ছিল আমার হৃদয়ের সম্পর্ক।

এ সবই ভুল। একটা মানুষ কিছুতেই বুঝতে পারে না আরকটা মানুষকে। যত নিকট হোক দুটি মন, এমনকি তারা বিনিময় করুক তাদের রক্ত, তবু তারা বুঝতে পারবে না একজন আরেকজনকে সম্পূর্ণভাবে। যে সেতু আমরা কল্পনা করে থাকি তা সেতুর বিভ্রম মাত্র। নইলে মুখে না বললে, ভাষায় না ভাবনাকে ব্যক্ত করলে কেন অচল হয়ে যায় জগৎ? নিশাতকে যেহেতু আমি কিছুই বলিনি আমার চেতনার বৈপ্লবিক পবির্তনগুলো সম্পর্কে, সে হয়ত মনে করে বসে আছে, আমি সেই আমিই আছি এবং আসলে আমি এক হৃদয়হীন পশু।

আশ্চর্য, মানুষের মনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মুখের রেখা বদলায় না, তা যদি বদলাতো তাহলে এই পৃথিবীতে বাস করা সহজ হতো অনেক।

সেদিন রেস্তোরাঁয় আমি বসেছিলাম স'পাঁচটায়। সাতটায় দেখা করবার সময় ছিল নিশাতের সঙ্গে। কিন্তু তার আগে ঘটলো অঘটন, আমার চশমার কাঁচ আচ্ছন্ন হয়ে গেল কালোকফির ধোঁয়ায় এবং আমি বিকৃত হতে লাগলাম হত্যাকারী হিসেবে। আমার মনে হলো, আগেই বলেছি, এখন আমার পক্ষে পৃথিবীর যে-কোন পাপ করা সম্ভব এবং তা

হচ্ছে লঘুকীর্তি। মনে হলো, এই বেঁচে থাকাটা অর্থহীন এবং আরো মনে হলো, ততোধিক অর্থহীন মৃত্যু।

সেই মুহূর্ত থেকেই আমার অধঃপাতের শুরু। কিংবা একে নবজন্ম বলব? জীবনের নতুন মুখ? এই কয়েক বৎসর আমি বয়সে যা না বেড়েছি তার চেয়ে মনটা বুড়ো হয়েছে। পুরনো আর প্রচলিত কথাগুলো এখন আমিও সোচ্চারে বলতে শুরু করেছি। যেমন, অধঃপাতের কথা লিখতে লিখতে আমি ভাবছি, আসলে আমরা কি জানতে পারি কোনটা আমাদের জন্যে ভালো আর কোনটা খারাপ? যা হয় মঙ্গলের জন্যেই হয়। এবং বুড়োদের মতো এখন আমিও বলতে দ্বিধা করি না. আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ লেখা হয়ে আছে কোথাও না কোথাও; অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিভিন্ন মানুষেরই কীর্তি।

ভাগ্যবাদীতার শুরুও সেদিন সেই বিকেলেই হয়েছিল, আমি অনুমান করছি। কারণ, নিজের বিধ্বস্ত স্বপ্ন থেকে চোখ তুলে যখন সময় দেখলাম, তখন সাড়ে সাতটা বাজে। নিশাতের সঙ্গে দেখা করবার নির্ধারিত সময় আধঘণ্টা হলো পেরিয়ে গেছে। এতক্ষণ বসে বসে কফির পেয়ালায় আমি বারবার সেই ছবিটাই দেখছিলাম আমার দৌড়ে আসা, দৌড়ে এসে ধাক্কা দিলাম বাবাকে, তিনি গড়িয়ে পড়লেন, একটা ধ্বস খসে পড়বার আগেই চিৎকার করে পিছিয়ে এলাম আমি।

অভিভূতের মতো উঠে এলাম রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এসে দেখি সিনেমা হলের মাথায় নতুন ছবির ব্যানার লাগাচ্ছে। নৃত্যভঙ্গিমায় দাঁড়ানো মেয়েটির কাটা ছবিতে দড়ি পরিয়ে

আস্তে আস্তে কুলিরা টেনে তুলছে পোর্টিকোর মাথায়। একটা অতিকায় স্বপ্নের মতো সে উঠে যাচ্ছে। আমি হা করে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম।

আমার যাওয়া হলো না। নিশাত এতক্ষণে আমার জন্যে ইস্কুলের বোর্ডিং গেটে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে ফিরে গেছে। কাঁঠালতলা দিয়ে পুকুরের পাড় ভেঙ্গে বাসায়। বাসায় গিয়ে খোকনকে কোলে নিয়ে হয়ত ভাবছে কেন আমি এলাম না? আমিতো কোনদিন কথা দিয়ে এরকম করিনি। হয়ত কাঁঠালগাছের নিচেও দাঁড়িয়েছে কিছুক্ষণ যদি আমি শেষ মুহূর্তে আসি, যদি শোনা যায় কোনো স্কুটারের শব্দ।

নিশাত কি জানবে কী আমার হয়ে গেছে। নিশাতকে আমি কোনদিন বলতে পারব না। ঠিক তখন ইন্টারভ্যাল হলো। আচমকা ভরে উঠল সিনেমা হলের সামনের জায়গাটুকু। আর দাঁড়িয়ে থাকা গেল না। লোকের ধাক্কায় আমি ক্রমাগত নাজেহাল হচ্ছি।

তখন হাঁটতে শুরু করলাম। সিঙ্গারের সামনে দিয়ে চলতে লাগলাম স্টেডিয়ামের দিকে। সে চলায় না আছে কোনো উদ্দেশ্য, না কোনো চেতনা আমবে মনে হচ্ছে, আমাকে এরকম। হাঁটতে হবে এবং থামলে চলবে না। যেন আজ সারারাত্রির মধ্যে আমি হাঁটতে পারলো এবং পৌঁছে যেতে পারবো পৃথিবীর অপর প্রান্তে।

আজ আমার মনে হয়, সত্য থেকে পলায়নের স্পৃহা সে মুহূর্তে প্রবল হয়ে উঠেছিল আমার ভেতরে।

স্টেডিয়ামের মোড়ে দাঁড়িয়ে ওষুধ বেচা হকারদের খেলা দেখলাম খানিক; আবার হাঁটতে শুরু করলাম। সেকেণ্ড গেটের পাশে একসিডেন্ট হয়েছে, উল্টে পড়ে আছে নতুন ঝকমকে একটা গাড়ি, পাশে দাঁড়ানো একটা ট্রাক, ড্রাইভার পালিয়েছে। লোকেরা উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বলছে, দৌড়ুচ্ছে, ভিড় করছে, আহতকে আরেকটা গাড়ি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি সেখান। থেকে এগিয়ে বড় চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে ভাবলাম কোনদিকে যাবো। একটা সিগারেট ধরালাম। তেতো লাগল। কাশি উঠল। হাঁটতে লাগলাম পার্কের দিকে, পার্ক পেরিয়ে রেসকোর্স বা হাতে ফেলে অন্ধকার গা ছমছমে রাস্তা দিয়ে শাহবাগের দিকে। শাহবাগের সামনে সার সার। ট্যাকসি দাঁড়িয়ে আছে। যেন বিরাট বিরাট হলুদ কালো ফুলের মালা গেঁথে রাতের রাস্তায় ফেলে রেখে গেছে কেউ।

কাল নিশাতকে টেলিফোন করব। কালকের কথা কাল ভাবা যাবে। আবার আমি হাঁটছি। আর্টস্কুলের বিরাট খোলা সিঁড়িতে দুধের মতো আলো বয়ে যাচ্ছে। গাছের গায়ে কারা যেন। কোন্ আন্দোলনের পোস্টার সেঁটে গেছে। দেখা যাচ্ছে পাবলিক লাইব্রেরীর দেয়ালে আঁকা ছবির একটা অংশ। আমি থমকে দাঁড়ালাম।

একটা লোক আমার কাছে সিগারেট ধরাবার জন্যে আগুন চাইল। ধরিয়ে নিয়ে গেল সে। আমি এগুলাম। নীলক্ষেত ফায়ার স্টেশনে লাল গাড়িগুলো জ্বলজ্বল করছে। বারান্দায় তাস পিটছে কারা? সামনে সুন্দর করে ছাঁটা ফুলের কেয়ারি, ঘন ঘাসের ঝোপ।

নদী ভাঙছিল। আমরা দেখতে গিয়েছিলাম। আমি দৌড়ে এসে ধাক্কা দিয়েছিলাম বাবাকে। একটা বড় ধ্বস ভেঙে পড়ল তারপর। তিনি আর উঠে আসতে পারেননি। এই ছাব্বিশ বছর কোথায় ছিল এই ছবিটা?

রাস্তার লোকগুলোকে একেবারে অন্যগ্রহের মনে হচ্ছে। তারা আসছে যাচ্ছে, গাড়ি বাস ছুটে চলেছে, রিকশাওলা বেল বাজাচ্ছে–কোনো কিছুর সঙ্গেই যেন আমার আর কোনো বন্ধন নেই।

আজিমপুরে আমার এক ক্লাশের একদা বন্ধু থাকতো। কখনো সখনো যেতাম তার ফ্ল্যাটে। তার দরোজায় গিয়ে ধাক্কা দিলাম। সে দরোজা খুলে অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিগ্যেস করল, কী হয়েছে তোমার? অসুখ?

বড় ক্লান্ত লাগছিল তখন। আলাপকে সংক্ষিপ্ত করবার জন্যেই মিথ্যে করে বললাম, হ্যাঁ, অসুখ।

সে রাতে ওর ওখানে থেকে গেলাম।

পরদিন টেলিফোন করতে গিয়ে আমার হাত কাঁপল। যখন রিসিভারটা তুলে ডায়াল করতে গিয়েও রেখে দিলাম, কাজি সাহেব অবাক হয়ে আমাকে দেখলেন। নিঃশব্দে একটা প্রশ্ন আঁকলেন ভ্রূ তুলে।

আমি যে চমৎকার মিথ্যে বলতে পারব, আমার ধারণা ছিল না। বললাম, সময় জানতে চেয়েছিলাম। হঠাৎ খেয়াল হলো আজ সকালেই ঘড়ি মিলিয়েছি, তাই রেখে দিলাম।

ও।

আরেকবার আড়চোখে দেখলাম কাজি সাহেবকে। কী জানি, তিনি যদি বুঝতে পেরে থাকেন, আমি মিথ্যে বলেছি। কিন্তু তিনি ততক্ষণে তার নথিপত্রে আবার ডুবে গেছেন। আমি বাঁচলাম।

নিশাতকে আর টেলিফোন করা হলো না।

৫. প্রথমে ছিল দ্বিধা

প্রথমে ছিল দ্বিধা। পরে এলো নিস্পৃহতা। সেদিন সন্ধ্যে সাতটায় নিশাতের সঙ্গে দেখা হবে, ও আমার জন্যে দাঁড়িয়ে ছিল কিন্তু আমি যাইনি। এই প্রথম ওকে কোনো কথা দিয়ে সে কথা রাখতে পারিনি। পরদিন টেলিফোনে যোগাযোগ করতে গিয়েও পারলাম না, দ্বিধা আমাকে থামিয়ে দিল। কাজি সাহেবের চেম্বার থেকে তারপর যখন শরীর খারাপ বলে বেবিয়ে এলাম তখন আমাকে জড়িয়ে ধরলো এক অবসাদ আর নিস্পৃহতা। মনে হলো, আমার ভাগ্যই হচ্ছে নিশাত থেকে দূরে থাক, আমার সমস্ত সুখের কবর হয়ে যাওয়া। তখন বড় অর্থহীন মনে হলো আমার বাড়ির স্বপ্ন, গাড়ি, শখ, ফুটফুটে একটি ছেলের কল্পনা। মনে হলো, এসব থেকে নিজেকে আমি যতক্ষণ না বঞ্চিত করছি ততক্ষণ পিতৃহত্যার দায় থেকে আমার মুক্তি নেই।

আমি নিজেকে সবকিছু থেকে একেবারে দূরে সরিয়ে দিলাম। এই অভিশপ্ত জীবন আমাকে যে একটা ধারণ করতে হবে। এখানে কেউ বন্ধু হতে পারবে না, অংশ নিতে পারবে না।

নিশাত আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করেছিল কিনা বলতে পারব না। করে থাকলেও আমার তা জানবার উপায় ছিল না। কারণ সে আমার ঐ ঠিকানাটাই জানতো– জালালের বাসার ঠিকানা; কিন্তু মার কাছ থেকে ফিরে আসবার পাঁচদিনের মধ্যেই আমি জালালের বাসা ছেড়ে চলে যাই। যাই মানে, যেতে হয়েছিল। আমার দেয়া সেন্ট, চপ্পল, শাড়ির বিশ্রী ব্যাখ্যা করেছিল জালাল। এবং একদিন আমার সামনেই সে তার স্ত্রীর হাত

থেকে সেন্টের শিশিটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল ড্রেনে। সেদিনই আমি আমার বাক্স বিছানা গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে আসি। সেদিন আমার আরো দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যায় যে আমার স্পর্শমাত্রই অমঙ্গল। এই পরিস্থিতিতে জালালের কাছে নতুন ঠিকানা রেখে আসার কথা কল্পনাও করা যায় না। তাই নিশাত যদি এখানে খোঁজ করেও থাকে আমি আর জানতে পারিনি।

আরেকটা হতে পারত, নিশাত যদি আমাকে টেলিফোন করত কাজি সাহেবের চেম্বারে। কিন্তু পরদিনই, ঐ টেলিফোন তুলে রেখে দেয়ার পর, পনেরো দিনের ছুটি নিই আমি। সেই পনেরো দিনে আমি এতটা বদলে গেলাম যে, মনে হলো ওকালতি আর করবো না। সেই কথা লিখে একটা পোস্টকার্ড কাজি সাহেবকে পাঠিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিলাম। তাকে লিখেছিলাম, আমি ঢাকাতেই থাকছি না। কাজেই নিশাত যদি এখানেও খোঁজ নিয়ে থাকে তো ব্যর্থ হয়েছে।

এখন মনে হয়, সত্যি নিশাত সেদিন কী ভেবেছিল তার জীবন থেকে আমার এই আকস্মিক অন্তর্ধানে। একথা তো সে কখনো কল্পনাও করতে পারেনি। সে আমাকে ভালোবাসত এবং আমার ওপরে নির্ভর করে ছিল। আমি যে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে তাকে ভুলে যেতে পারব একথা সে বিশ্বাস করবে কী করে? সে নিশ্চয়ই মনে করেছে–আমি মরে গেছি, কী আমার স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে, কী কেউ আমাকে বন্দি করে রেখেছে। হ্যাঁ, এইসব অসম্ভব অবাস্তব কারণ ছাড়া আর কী ইবা সে ভাবতে পারত?

কিন্তু আসলে যা সত্যি তা নিশাত তার দুঃস্বপ্নেও দেখতে পারবে না। সে কি কেঁদেছিল? তার রাত কি বিদ্রি হয়েছিল? তার শরীরে কি জীবন-রসের ধারা ক্ষীণ, ম্লান হয়ে গিয়েছিল?

আজ আমার মনে হয়, নিশাত যদি আমার খোঁজ পেত, তাহলে আমার জীবন আবার অন্যখাতে বইতো। তার সঙ্গে যদি একবার দেখা হয়ে যেত আমার, তাহলে আমি স্বাভাবিক হয়ে যেতাম। মনে হয়, আমাকে যেভাবেই হোক তার খুঁজে বার করা উচিত ছিল। কিন্তু, এ পৃথিবীতে কার দায় পড়েছে আমার চেতন বা অচেতন মনের ইচ্ছেগুলোর তোয়াক্কা করবার? মানুষ নিজেই তার নিজেকে তৈরি করে এবং সেখানে অন্য কারো দায় নেই।

নিশাতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক এভাবে চুকিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত যে কী করে নিতে পারলাম সেদিন। সাতদিন আগেও তো কত অসম্ভব মনে হতো বিচ্ছেদ। আজ আমার সাকুল্যে এই ধারণা হয়েছে, মানুষ আবিষ্কার করতে পারে মহাদেশ, পর্বত, নক্ষত্র; জয় করতে পারে যুদ্ধ; সৃষ্টি করতে পারে সঙ্গীত; কিন্তু চির অচেনা চির অজেয় এবং স্বয়ম্ভ তার নিজেরই মন।

জালালের ওখানে থাকতেই, কী ওখান থেকে চলে আসবার কদিন পর, আমি বহুদিন পর আবার গিয়েছিলাম ফরাসগঞ্জে গোবিন্দর চা-দোকানে। কতকাল পরে সেখানে পা দিয়েই আগের মতো নাকটা ধরে উঠল রান্না করা ঝাল মুরগির ঝাঁঝালো গন্ধে, বাতাসে

ধোঁয়ার গুমোট, হলুদ দেয়ালে কালির পরত–এক মুহূর্তে যেন ফিরে গেলাম আমার সেই দিনগুলোয় যখন আমি পরীক্ষায় ফেল করে তিতাস ধরেছিলাম।

গোবিন্দ আমাকে দেখে হৈ হৈ করে উঠলো।

আসুন, আসুন স্যার। ওরে, চেয়ারটা মুছে দে। বলতে বলতে সে নিজেই একটা চেয়ার বেশ ঘষে মুছে দিল। হেসে জিগ্যেস করল, কেমন আছেন? অনেকদিন এদিকে আসেন না। অ্যাডভোকেট হয়েছেন শুনলাম?

বললাম, ভুলে যাইনি বলেই তো এলাম। তোমার দোকানটা যে কে সেই রয়ে গেল গোবিন্দ। চলে যায় স্যার। কী খাবেন? মুরগি পাউরুটি? না ওমলেট?

দাও, তোমার বেস্ট যা আছে। মনে আছে, আমি ঠাট্টা করে বলতাম এটা আমাদের লিটল শাহবাগ।

হেঁ হেঁ করে হাসল গোবিন্দ। তার কোকড়ানো বাবড়ি চুলে হাতের পিঠ ঘষলো অনাবশ্যক ভাবে একবার। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে দরোজার মুখে কয়লার চুলোয় চাপানো ডেকচির ঢাকনাটা তুলল। আমি ভেতরে গেলাম।

যাদের আশা করেছিলাম, সবাই আছে। আমার তাসের পুরনো বন্ধুরা এবং নতুন আরো দুটি মুখ। পুরনোরা আমাকে দেখে প্রথমে বোকা হয়ে গেল। আর তাদের অবাক হওয়া দেখে নতুনেরা তীক্ষ্ণ চোখে দেখতে লাগল আমাকে।

আমার বেশ ভালোভাবেই মনে আছে, আমিও অবাক হয়েছিলাম ওদের সেই একই টেবিলে এই দীর্ঘদিন পরেও একই ভাবে গোল হয়ে বসে থাকতে দেখে। তাসের প্যাকেটটা তেমনি পড়ে আছে পাশে, হাতগুলো উদ্যত এবং স্থির। যেন আমার উঠে যাওয়া আর আজ ফিরে আসার মধ্যে মাত্র কয়েক মিনিট কাল অতিবাহিত হয়েছে; আমি বেরিয়ে গিয়ে ঐ কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তিন বৎসর পরিক্রমা করে এসেছি–তিন বৎসর।–নিশাত, ভালোবাসা, বিয়ের কথা, মা, আমার বাবার মৃত্যুর ইতিহাস। তফাৎটা কেবল এখানে, আগে আমি ছিলাম গোবিন্দর ভিনিগারের শিশির মতো ফালতু, আর আজ ওরা আমাকে দেখছে মুগ্ধ চোখে, ঈর্ষার কাঁচের ভেতরে দিয়ে; যেন রাজার সঙ্গে দেখা করে গাঁয়ের মানুষ আবার গাঁয়ে ফিরে এসেছে।

লোকমান টেবিলে চাপড় দিয়ে বলে উঠল, বাই জোভ, কে এসেছে ভাঙা ঘরে?

আসাদ বলল, বেশ যাহোক আপনি। একেবারে লাপাত্তা। একবার তো আসতে হয়, নাকি? তাইতো এলাম।

আরো দুহাত খেলল ওরা! আমি বসে বসে দেখলাম। একবার একটা তর্ক হলো তাস নিয়ে। আমাকে তার সালিশী করতে হলো। গোবিন্দ মুবগি পাউরুটি এনে দিল। পর পর দুকাপ চা খেলাম আমি।

ওরা উঠে দাঁড়াল। আমি বললাম, এত সকালে কোথায়?

তখন এ-ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করল ওরা। বিধাটা কোথায় বুঝতে পারলাম না। অবশেষে লোকমান বলল, যাবেন আপনি?

কোথায়?

যেখানে যাচ্ছি।

সবাই যাচ্ছে?

হ্যাঁ, আগে থেকেই ঠিক হয়েছিল। চলুন মন্দ হবে না।

আমি ভেবেছিলাম, সিনেমা। বললাম, বেশ তো।

বেরুনো গেল ওদের সঙ্গে।

সে রাতে আমি প্রথম মদ্যপান করি। খারাপ লাগছিল বেশ, কিন্তু ওয়াক-থু করিনি। বরং আমার বেশ স্ফুর্তি করছিল ভেবে যে এতকাল শুনেই এসেছি, জিনিসটার স্বাদ নেওয়া গেল। নেহাৎ মন্দও নয়। গলা পুড়তে পুড়তে ভেতরে নেমে যায়, পাকস্থলীতে গিয়ে ফণা তুলে বসে থাকে। তারপর মনে হয় মাথার পেছনে কে যেন মৃদু হাতে অবিরাম চাপড় দিচ্ছে–তার আরামে ভারী হালকা আর রঙিন হয়ে আসে মেজাজটা।

পরদিন আমি ওদের খাওয়ালাম। এবং তারপর থেকে নিয়মিত। ব্যাঙ্কে যে টাকাগুলো ছিল তার সঠিক অঙ্ক মনে থাকত না; মনে হতো আমি যদি কিছু নাও করি সারাজীবন আর এভাবে সারারাত ফ্লাস খেলে, মদ খেয়ে, হৈ হৈ করে কাটিয়ে সারাদিন পড়ে পড়ে ঘুমোই তো কোন অভাব হবে না কোনদিন।

নিশাতের কথা এখন আর মনে পড়ে না। আমার মনে হয় না এই এক বৎসরে নিশাতকে আমি ভাববার চেষ্টা আদৌ করেছি। একদা তাকে ভালোবাসঞ্জাম। সে ভালোবাসা সুদূর আর অবাস্তব মনে হতো এই দিনগুলোয়। যেন অন্য কারো জীবনে ওসব ঘটে গেছে, কিংবা আমার আরেক জীবনে। নিশাতের কোনো ছবি আমার কাছে ছিল না। আমার মনে হয়, যদি চোখ বুঝে দেখবার চেষ্টা করতাম তো দেখতে পেতাম না নিশাতকে। নিশাতের চেহারাই ভুলে গিয়েছিলাম আমি।

এই সময়ে একটা নতুন ভাবনা আমাকে পেয়ে বসেছিল। আমি ভাবতে চেষ্টা করতাম আমার বাবাকে। যে কোনো মুহূর্তে পেয়ে বসত এই ভাবনার রোখ। টের পেতাম, কেন্দ্রীভূত হয়ে আসছে আমার চোখ–কোনো বস্তু বা শূন্যের মধ্যে চোখ রেখে আমি কোন

এক অদৃশ্য বলীয়ানের সঙ্গে লড়াই করতাম, যে শক্তিমানের কাছে গচ্ছিত রয়েছে আমার বাবার মুখ। যেন তাকে হারিয়ে দিতে পারলে, দৃষ্টির তীরে বিদ্ধ করতে পারলেই সব পেয়ে যাবো স্পষ্ট দেখতে পাবো বাবাকে।

একেকদিন তাস হাতে স্তব্ধ হয়ে যেতাম। তাসের টেক্কা হঠাৎ বিস্তৃততর হতে থাকতো আমার সমুখে। টেক্কার শরীরে দুর্বোধ্য কারুকাজের ভেতরে ছড়ানো ছিটানো দেখতে পেতাম–যুগলের অংশ, চিবুক, নাকের রেখা, ঠোঁট–ধাঁধার মতো, খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন; আমার সাধনা সেগুলো একত্রিত করে মিলিয়ে বাবার মুখ সৃষ্টি করা।

বন্ধু কেউ ধাক্কা দিলে ঘোরটা কেটে যেত। খুব অপ্রস্তুত হয়ে যেতাম। খেলা আর জমতো না।

এবারে আমার একটা উন্নতি লক্ষ করা গিয়েছিল। সে আমার কপাল খুলে গিয়েছে। আগে, নিশাতের আগে, যখন এই গোবিন্দর দোকানের পেছনে বসে খেলতাম, তখন হারতাম। যদিও বা জিততাম তো সেটা এমন কিছু বিস্ময়কর জিৎ হতো না। আর আজ ওরা আমাকে তাস বেঁটে দিতে বলে, কপাল তো তোমার। লাও দেখি কী হয়।

কী আবার হবে? গোবিন্দ যখন দোকান বন্ধ করছে বলে শেষবারের মতো তাগাদা করত, আর আমরা আরো এক হাত বলে আরো তিন চার হাত খেলে উঠতাম, তখন দেখা যেত আমার পকেটে লাভের কড়ি আসল উপচে উঠেছে। অবশ্যি, আমার মনটা ছিল খুব উদার এবং টাকাগুলোর সদ্ব্যবহার হতো মদের বোতলে, মাংসে, সিনেমায়,

সিগারেটে। আজ মনে হয়, ওরা আমাকে ভালোবাসত। আমার সম্পর্কে একটা উচ্চ ধারণা ছিল ওদের। কিন্তু কী কারণে এই ভালোবাসা, আর কেনই বা এ উচ্চ ধারণা তা বলতে পারব না।

ওরা ছিল কয়েকজন চমৎকার বন্ধু। কোনো প্রশ্ন করত না, আমার কোনো কিছুই জানতে চাইতো না, দিনমানে কী করি, আমার সংসার আছে কী নেই–এসব ওদের কাছে তুচ্ছ। আমার তো মনে হয়, আমার পুরো নামটাও ওরা কেউ বলতে পারবে না। অথচ কত গভীরভাবে আমরা একে অপরকে স্বীকার করে নিয়েছিলাম। মানুষ যখন স্কুল বানায়, দেশ চালায়, সংসার করে, হাসপাতাল কী মসজিদের পরিকল্পনা করে তখন তারা একজন আরেকজন সম্পর্কে কিছু না জেনে একসঙ্গে মিলিত হতে পারে অথচ সেই মানুষই যখন একসঙ্গে জুয়ো খেলে, মদ্যপান করে, ধর্ষণে সঙ্গী হয়, রাহাজানির জন্যে জোট পাকায় তখন কত সহজে এবং পরস্পরের কত কম তথ্য জেনে হাতে হাত মেলাতে পারে। আসলে, আমাদের রক্তের ভেতরে রয়েছে পাপ আর বুদ্ধির মধ্যে পুণ্যের ধারণা। এই পাপের বেসাতিতে বন্ধু জোটে সহজে। রক্তের ডাক বলেই হয়ত পাপের বন্ধু যত নিকট হতে পারে পুণ্যের বন্ধু ততখানি হতে পারে না।

আমরা একসঙ্গে মদের টেবিলে প্রাণ খুলে সব কথা বলতাম, বিশ্বাস করুন, কোনো রাখা ঢাকা ছিল না; পারতাম একজন আরেকজনের সমুখেই ট্রাউজারের বোম খুলে প্রস্রাব করতে; আরো পারতাম মেয়েমানুষের ঘরে একজন ঢুকলে বাকি সবাই বাইরে অপেক্ষা করতে, আর পারতাম সরকারকে নির্ভয়ে গালি দিতে, বেপরোয়ার মতো দেশনায়কদের সম্পর্কে যা খুশি তা বলতে–যার একাংশ বাইরে গেলে নির্ঘাত রাষ্ট্রদ্রোহীতার দায়ে পড়তে

হতো। আমার সময়গুলো কাটছিল চমৎকার। জীবন মৃত্যুর দায়মুক্ত পরমপুরুষের মতো মনে হতো আমার নিজেকে–যার পাপে পাপ নেই, পুণ্যে প্রয়োজন নেই, বন্ধন যার কাছে এক অশ্রুত শব্দ।

আমি জানি, আপনারা চমকে উঠেছেন মেয়েমানুষের উল্লেখে। আমি নিজেও এখন কম আশ্চর্য বোধ করি না, যখন পেছনের দিকে তাকিয়ে আমার এ ছবিটা দেখতে পাই। আমিওতো কোনদিন ভাবিনি, এরকম হয়ে যাবো। আমার বরাবর ধারণা ছিল, পুণ্য বরং সহজে করা যায়, কিন্তু পাপ করতে রীতিমত প্রস্তুত হতে হয়ে নিজেকে। যখন আমি এম.এ পড়তাম তখন কী জানি কীভাবে আমার মাথায় ঢুকেছিল কোনো মেয়েমানুষের সঙ্গে রাত কাটাবার খেয়াল। কার কাছে যেন শুনেছিলাম জিন্নাহ এভেন্যুর মোড়ে দাঁড়ালেই সন্ধ্যের সময় দালাল এসে কাছে দাঁড়ায়, শ তিরিশ টাকা লাগে। কয়েক মাস ভাবতে ভাবতে অবশেষে একবার সদ্য পাওয়া চাচাদের মনি অর্ডার থেকে তিরিশ টাকা পকেটে ফেলে রাত আটটায় জিন্নাহ এভেন্যুতে এসে দাঁড়ালাম। মা তো ভোঁ ভোঁ করছিলই, যখন এসে রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছি আমার হৃদপিণ্ড যেন হাজারখানেক সৈন্যের মতো দুমদুম করে মার্চ করে চলেছে, আর কোনো কিছু শুনতে পাচ্ছি না। ডিসেম্বরের শীতে পেয়েছে যেন ট্রাউজারের ভেতরটা। একটা করে তোক নির্লিপ্ত মুখে ছায়ার মতো এগিয়ে আসে, আমার মনে হয়, এখুনি বিস্ফোরণ হবে কোথাও, মরে যাবো, লোকটা চলে যায়।

সে রাতে একাই ফিরে আসতে হয়েছে। কিছু হয়নি। কোনো দালালের দেখা পাইনি। দেখা পেলেও যে যেতাম তা নিশ্চিত করে বলতে পারি না। কেমন একটা মোহের মতো

পেয়ে বসেছিল, কোনো বোধই ছিল না। যখন ফিরে এলাম আবার এত স্বচ্ছন্দ মনে হলো নিজেকে যেন ফাঁসির আসামি খালাস পেয়ে বাড়ি যাচ্ছি।

সেই আমি মাত্র কয়েক বৎসর পরে কত সহজে পয়সা দিয়ে পাওয়া একটা মেয়েকে অভিজ্ঞ শিকারীর মতো কোলে টেনে সিক্ত চুমো দিতে পেরেছিলাম। আর যখন মেয়েটা আমাকে লোক দেখানো খিদে বাড়ানো লজ্জা দিয়ে দূরে রাখবার চেষ্টা করছিল, আমি তাকে হ্যাঁচকা টানে বিছানায় ফেলে তার ওপরে শরীরের সমস্ত ভার ছুঁড়ে দিয়ে বলতে পেরেছিলাম, খুব হয়েছে। বাইরে আরো তিনজন বসে আছে তোমার জন্যে।

অবশ্যি এটা খুব নিয়মিত কিছু ছিল না, যেমন তাস বা মদ। ঝোঁক উঠলে, কিংবা ভালো কিছুর খবর পাওয়া গেলে বেরুতাম। একবার একজনের সঙ্গে শুতে গিয়ে মাথার মধ্যে ঘুরে। উঠল নিশাতের ছবি। আমার মনে হলো, বিয়েটা যদি হতো তাহলে আজ এই মেয়েটার বদলে নিশাতের শরীর আমার নিচে নৌকোর মতো দুলে দুলে উঠতো। পরপর কয়েকদিন রোজ রাতে রোখ উঠতো আমার, আর আমি বেরুতাম। নিত্য নতুন চাই। আরো নতুন। আমি ও-রকম সময়গুলোতে চোখ বুজে শরীর আর মনকে কেন্দ্রীভূত, ভয়াবহ ও বিক্ষুব্ধ করতে করতে কল্পনা করতাম নিশাতকে। কানে যেন শুনজে পেতাম নিশাতের কণ্ঠস্বর, তার অনুনয়।

নিশাতের সঙ্গে বিয়ে হবার কোনো বাধাই ছিল না। তবু হলো না। আজকাল আমি ভাগ্যদেবী হয়ে উঠেছি এবং আগেই বলেছি, এখন আমার মনে হয় অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ আমাদের নিছক কল্পনা। সবকিছুই ঘটেছে এবং ঘটবে। জীবন এক অসম্ভব

প্রস্তাব এবং তার সমাধা করতে হলে আমাদের কর্মগুলোকে অসম্ভবের পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। নিশাতের সঙ্গে যে আমার বিয়ে হবে না তার ইঙ্গিত অনেক আগেই আমার পড়ে নেয়া উচিত ছিল, যা তখন আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। বিয়ের কথা যেদিন বলব সেদিন নিউমার্কেটের কাছে স্কুটার অ্যাকসিডেন্ট হতে হতে আমরা বেঁচে গেলাম। নিশাত বিয়েতে রাজি হয়ে যখন বাসে উঠে চলে গেল, তখন পকেটে হাত দিয়ে দেখি আমার পকেট কাটা গিয়েছে। তবু আমি লিখন পড়তে পারিনি। আর শেষ অবধি এই নিশাতের কারণেই আমি জানতে পেলাম, আমার হাতে মৃত্যু হয়েছে বাবার; এই যে দুটো হাত, এই হাতে ধাক্কা দিয়েছি তাকে, পড়ে গেছেন বর্ষায় উন্মত্ত নদীতে সাঁতার জানতেন না, মৃত্যু থেকে জীবনের পাড়ে আর উঠে আসতে পারেননি তিনি।

আজ আমি ভাবি, ওটা কি সত্যি সত্যির পর্যায়ে পড়ে? আজ যখন মার মুখে কথাটা শোনবার পর একটি বছর চলে গেছে, নিশাতের সঙ্গে আবার অপ্রত্যাশিত আমার দেখা হয়েছে, আমি খানিকটা পারছি নিরপেক্ষ দূরত্ব থেকে পুরো ঘটনাকে দেখতে।

তিন সাড়ে তিন বছরের শিশু যা করছে তা কি সজ্ঞান মানুষের জন্যে প্রযোজ্য আইন দিয়ে দেখা সম্ভব? না, উচিত?

কিন্তু যা ঘটে গেছে তা সত্য। আমার ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সজ্ঞানে কী অবোধ-চেতনায় যে মৃত্যু আমি এ দুহাতে একদা ধারণ করেছিলাম তাকে অস্বীকার করবো কী করে?

.

নির্জন ঘরে এখন রাত্রির নিস্তব্ধতা তাকিয়ে আছে আমার দিকে তার গভীর চোখ মেলে। বাতি জ্বালিয়ে লিখছি, লিখতে লিখতে ঘামছি, আবার লিখছি। খেই হারিয়ে যাচ্ছে কথার, স্মৃতির পল্লবিত শাখার সহস্র পাতায় লাগছে ঝড়ের মাতন, মনে হচ্ছে আমি বিশ্বের সবচে একা অথচ বিশ্বের সঙ্গে আমার বন্ধন এত যে নিবিড় তা এর আগে এমন করে আর উপলব্ধি করিনি। আমার জীবন-কাহিনীর কোনো সুস্পষ্ট শুরু নেই, ধারাবাহিকতা নেই স্মৃতির কয়েকটা বিচ্ছিন্ন ছবির অ্যালবাম নিয়ে আজ আমি আমার হারানো ভালোবাসার সন্ধান করছি। আবার আমি সৃষ্টি করতে চলেছি পিতাকে আমার আদর্শ, কর্ম আর লক্ষ্যের মধ্যে। আমার যন্ত্রণার উপশম হচ্ছে এই রচনার মাধ্যমে। যা ঘটে গেছে তা আর ফেরাতে পারব না; কিন্তু লেখক হয়ে লিখতে পারব যা ঘটতে পারত-আমার লেখায় সাজাতে পারব অভিজ্ঞতা, মূল্যবোধ, আর জীবনকে, যেন আমি চেয়েছিলাম সৃষ্টি করতে পারব মানুষ, যেমনটি আমি নিজে হতে পারিনি।

.

কিন্তু লেখক হবার এই সিদ্ধান্তটাও আকস্মিক। একেবারে একটা ঝড়ের মতো। সেদিন ছিল এরকম—

গোবিন্দর দোকানে রোজকার মতো বসেছিল তাসের আড্ডা। এই আমি প্রথম ক্রমাগত হারছিলাম। বন্ধুরা খুব অবাক হচ্ছিল এবং একজনকে বেশ লজ্জিত মন হচ্ছিল তার জিতবার পরমুহূর্তে। আমি বললাম, তাতে কী আছে? চলুক না? কিন্তু খেলা চলল ধুকে

ধুকে– কোথায় যেন সুর কেটে গেছে। আমি ওদের মেজাজ ফিরিয়ে আনবার জন্যে প্রস্তাব করলাম, চলো কোথাও যাই। খানিকটা গেলা যাক। আর যদি পাওয়া যায় বলে বা চোখ ছোট করলাম।

ওরা হৈ হৈ করে উঠে দাঁড়াল। বলল, চমৎকার। চমৎকার। আজ থাক তাস পড়ে।

বেরিয়ে কোথাও পাওয়া গেল না কিছু। সব বারই বন্ধ হয়ে গেছে। একটা মেয়েমানুষের বাড়ি আমাদের জানা ছিল যেখানে খানিকটা মদ রাখা থাকত। আমার বন্ধুরা বলল, চলো সেখানে।

আমার স্পষ্ট মনে আছে, বন্ধুরা আমাকে স্ফুর্তিতে রাখবার জন্যে কী আকুলি বিকুলিই না করছিল সে রাতে। আমি যে বারবার তাসে হেরে যাচ্ছিলাম, ওরা ধরে নিয়েছে, আমার মনটা খুব দমে গেছে। একটা পয়সা খরচ করতে দিল না আমাকে ওরা। নিজেরা খানিকটা খেল। আর সবাই চলে গেল আমাকে রেখে। যেন আমি একা একটা রাত মেয়েটার কাছে থাকলে মনটা ভালো হয়ে যাবে। ওরা সত্যিই ভালো বন্ধু ছিল আমার। ওদের ধারণা যতটুকু করলে একজন বন্ধুকে খুব চাঙ্গা করে তোলা যায় তাই করেছে। ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে ঘুমোতে পারত সবাই মেয়েটাকে নিয়ে সে ইচ্ছে বলি দিয়েছে ওরা একজন বন্ধুর জন্যে।

ওরা যখন চলে গেল রাত একটা। আমি প্রথমে কিছু বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ মেয়েটা হাসল, আর বুঝতে পারলাম আমি একা। কিন্তু সে বোঝাটাও স্পষ্ট করে নয়–

মাথার মধ্যে নয়–রক্তের ভেতরে যেন ছলাৎ করে উঠল। আমি উঠে বাইরে গেলাম, নাম ধরে ডাকলাম ওদের, কিন্তু সাড়া পেলাম না।

রাস্তাটা জনশূন্য। আজ আমার ভাবতে অবাক লাগে নিয়তিই বোধহয় আরেকবার, বোধহয় শেষবারের মতো আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তখন; নইলে পা টলছে নেশায়, মাথা ঘুরছে মিলের চাকার মতো, তবু অতটা পথ হাঁটলাম কী করে?

বেরুতেই মেয়েটা আমাকে ধরে ফেলল। বলল, যাচ্ছেন কোথায়?

বললাম, কী চাও? টাকা?

জানতাম, অন্তত একটু আমার জ্ঞান ছিল, বন্ধুরা সমস্ত টাকা দিয়ে গেছে, এমনকি মেয়েটার জন্যেও। তাই সে যখন বলল–হ্যাঁ টাকা–তখন আমি কুৎসিত একটা গাল দিয়ে তার হাত ছুঁড়ে ফেলে দিলাম আমার জামা থেকে। সে দাঁড়িয়ে রইল। আমি আমার বন্ধুদের নাম ধরে উচ্চকণ্ঠে ডাকতে ডাকতে পথ দিয়ে হাঁটতে লাগলাম।

কেউ নেই ওরা। কোথায় গেল? আমার রক্তের ভেতর থেকে ডাক উঠছে ওদের জন্যে। একা লাগছে। আমি আরো জোরে ডাকতে লাগলাম, আসাদ, লোকমান, সমশের। কান পেতে রইলাম যদি ওদের কণ্ঠে শুনতে পাই আমার নাম, মুশতা–ক।

রাতের অন্ধকার থেকে একটানা শব্দ শুনছি ঝিঁঝির, আর কিছু না। আকাশে কোটি কোটি নক্ষত্র জ্বলছে, যেন তাদেরও পুড়ে যাবার চিড় চিড় শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু আমার নাম ধরে ডাকছে না কেউ। আবার আমি ডাকলাম, লোকমা–ন।

ফকিরাপুল পেরিয়ে, নটরডেম কলেজ ছাড়িয়ে এসে পড়লাম মতিঝিল কমার্শিয়াল এরিয়ার চৌরাস্তায়। চারটা পথ চলে গেছে চারদিকে। কোন দিকে যাবো? পেছনের পথটা আমাকে নিয়ে যাবে যেখান থেকে আমি উঠে এসেছি। বন্ধুরা গেছে সমুখে। তিনটে পথের কোটা ধরে? আমি জানতাম কে কোথায় থাকে, কিন্তু সেই নেশাগ্রস্ত মুহূর্তে তা মনে পড়ল না। আমার মনে হলো, পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ওরা। তাই ভয় করতে লাগল আরো। উন্মাদের মতো আবার আমি ডাকলাম ওদের নাম ধরে।

তাকিয়ে দেখি নবাবপুর রেলওয়ে ক্রসিং-এ দাঁড়িয়ে আছি আমি। রেল গেটটা বন্ধ। একটা ট্যাক্সি থমকে দাঁড়িয়ে আছে তার সমুখে। কয়েকটা মুখ ভেতরে। যেন এই প্রথম আমি এক মহাপ্লাবনের পর মানুষের মুখ দেখলাম। ক্ষুধার্তের মতো তাকালাম তাদের দিকে। ট্যাক্সির গায়ে ফুলের ম্লান মালা জড়িয়ে আছে, কয়েকটা ফালি ফালি আলো ভেতরটা খণ্ডিত ছবির মতো করে তুলেছে।

নিশাত। সে আমাকে চোখ তুলে দেখল।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ভিখিরি এই এত রাতেও কোথা থেকে এসে হাত বাড়ালো আমার সমুখে। আমি এ–পকেট ও–পকেট হাতড়ে একটা আনি বার করলাম। একটা

ইঞ্জিন মাথার ওপরে আগুনের ফুলঝুরি ছড়াতে ছড়াতে চলে গেল। ভিখিরিটা গিয়ে দাঁড়াল ট্যাক্সির কাছে। আবার সে হাত বাড়াল।

চলতে লাগল ট্যাক্সিটা। ক্রসিং বারের লালবাতিটা দুলতে দুলতে স্থির হয়ে গেল আকাশে। কুক্কমে সাজানো বিয়ের শাড়ি পরা নিশাত। পাশে তার বর। বিয়ের শেষে ফিরে যাচ্ছে ওরা ওদের বাসরে। বরের মুখ আমি দেখতে পেলাম না।

বন্ধুদের নামগুলো ঘুরতে লাগল আমার ভেতরে, কিন্তু আর ডাকতে পারলাম না আমি। নিশাত। ঝাঁপিয়ে পড়া দুরন্ত মমতায় আর সমস্ত কিছু স্থির হয়ে আসা অতল ভালোবাসায় আমি বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

না কি স্বপ্ন দেখছি?

তখন আমার মাথার মধ্যে একটা জলপ্রপাত যেন হঠাৎ বিশ্ব ডোবানো গর্জন করতে করতে নেমে এলো, যার পুঞ্জিভূত, উৎক্ষিপ্ত, ফুলের মতো কোটি কোটি শাদা ফেনায় আমি প্রত্যক্ষ করতে লাগলাম অবিশ্বাস্য, নতুন, চিরন্তন, মর্মরিত এক সুন্দর।

একটা স্কুটার এসে বিকট শব্দ করে থামল আমার পাশে। এক মুহূর্তে আমার সবকিছু ফিরে এলো আমার কাছে। ড্রাইভার গলা বাড়িয়ে জিগ্যেস করল, সাব কহি যানা হ্যয়?

বললাম, হ্যাঁ কহি তো যানা হয়। মুঝে ঘর পহচা দো।

আমাকে নিয়ে স্কুটার ছুটে চলল সেই পরিচিত প্রচণ্ড শব্দ, গিয়ার ফেঁসে যাওয়ার করুণ আর্তনাদ, চাকার নিচে অসমতল রাস্তার ধাক্কা। ড্রাইভার জানে না যাকে সে উঠিয়েছে আর যাকে সে নামিয়ে দেবে তারা দুজন এক নয়। রাত্রির ভেতর দিয়ে ঘুমন্ত শহরের রাজপথে একটা মৃত্যু থেকে জন্মের দিকে চলেছে তার স্কুটার।

নয়াপল্টন, ঢাকা
১৯৬৩